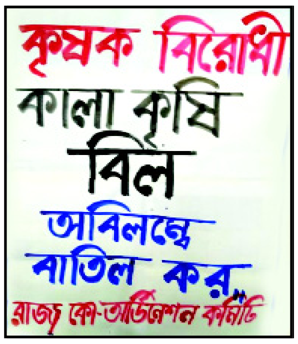

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

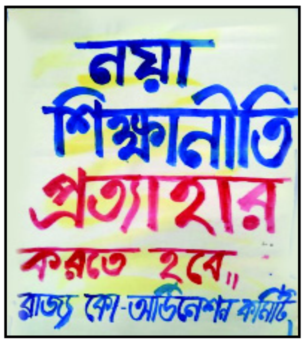

বিশেষ চতুর্থ ই-সংস্করণ, সেপ্টেম্বর '২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ

২৬ নভেম্বর, ২০২০

কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট তোষণ নীতির বিরুদ্ধে

সর্বাত্মক ধর্মঘটে স্তব্ধ হবে সারা দেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী এবং জনবিরোধী নীতি প্রতিরোধে আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল সি আই টি ইউ সহ দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। ২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির জাতীয় কনভেনশন থেকে ৭ দফা দাবিতে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। করোনাজনিত পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আহূত এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ সংগ্রামের মঞ্চ এবং সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি। ছাত্র-যুব-মহিলা সহ বিভিন্ন গণসংগঠনও এই ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

ধর্মঘটের দাবিগুলি হলো ঃ

● আয়করদাতা নয়, এমন সমস্ত পরিবারকে মাসে নগদ ৭৫০০ টাকা করে দিতে হবে। ● ঐ সমস্ত পরিবারকে মাসে মাথা পিছু ১০ কেজি করে খাদ্যশস্য দিতে হবে ● গ্রামীণ রেগা প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্প শহরেও চালু করতে হবে। ● সংসদে জোর জবরদস্তি পাশ করানো শ্রমকোড বিল বাতিল করতে হবে। ● কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবিরোধী সম্প্রতি প্রণীত তিন কৃষি আইন খারিজ করতে হবে ● রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার ঢালাও বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি সংস্থায় চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্প বাতিল করতে হবে ● অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষা সহ সর্বজনীন পেনশন চালু করতে হবে। □

৯ নভেম্বর ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে আগামী ২৬ নভেম্বর সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ৭ দফা দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এ রাজ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করবেন। বিধি অনুযায়ী আগামী ৯ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করবে সংগঠন। ঐদিনই দুপুরে টিফিন বিরতিতে সারা রাজ্যে দপ্তরে দপ্তরে ধর্মঘটের দাবিগুলির সমর্থনে অনুষ্ঠিত হবে বিক্ষোভ সভা। বিকেল ৪টে কলকাতার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে সাংবাদিক সম্মেলন। সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতায় অবস্থানরত সংগঠনের নেতৃত্ব-সংগঠকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ সভা কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। এছাড়াও শরোদৎসবের অব্যবহিত পরেই সারা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। □

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৬৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী কর্মসূচী

১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, তৎকালীন রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দপ্তর ও ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনগুলির (এর মধ্যে কয়েকটি স্বাধীনতার আগে থেকেই ছিল) যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ হিসেবে রাজ্য

কো-অর্ডিনেশন কমিটি আত্মপ্রকাশ করে। সরকারী বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও কালা সার্কুলারকে পাশ কাটিয়ে এমন একটি যৌথ মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকেই। ১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, তৎকালীন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) প্রায় তিরিশ হাজার কর্মচারীর জমায়েত থেকে দাবি উঠল দু-টাকা নয়, ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারী

কর্মচারীদের ন্যায় মহার্ঘভাতা দিতে হবে এবং সমস্ত বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীদের পুনর্বহাল করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ সভা সংগঠিত হওয়ার কয়েকদিন আগে, ২৪ আগস্ট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে রিলিফ হিসাবে, আড়াইশো টাকা পর্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীদের দু-টাকা বিশেষ ভাতা হিসেবে ঘোষণা করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার। যৌথ আন্দোলনের পক্ষ থেকে ২৫ টাকা বিশেষ ভাতার দাবি ওঠার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সরকার প্রদত্ত ২ টাকা মানি অর্ডার করে ফেরৎ দেওয়া হবে। ঐ সমাবেশের সভাপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়সহ ৬জন নেতাকে সাসপেন্ড করা হলো। কিন্তু কেন্দ্রীয় আন্দোলন তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিরবিচ্ছিন্ন পথ চলাকে রোখা গেল না।

● দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ফেসবুক লাইভে সংগঠন

১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পথচলা শুরু করেছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এবছর ৮ সেপ্টেম্বর সংগঠন তার ৬৪ বছর পূর্ণ করে ৬৫-তে পা দিল। এই সময়কার করোনাজনিত পরিস্থিতির কারণে কোনো বৃহৎ জমায়েতধর্মী কর্মসূচী করে ৬৫তম বর্ষ উদ্যাপনের কোনো সুযোগ ছিল না। তাই দুপুরে টিফিন বিরতিতে সারা রাজ্যজুড়ে দপ্তরে দপ্তরে কর্মসূচীর পাশাপাশি ঐদিনই সন্ধ্যায় ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে, চিন্তন ফেসবুক পেজে সংগঠনের সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরা হলো। আলোচনার বিষয় ছিল 'সময়ের দর্পণে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন; সেকাল ও একাল'—দুটি পর্বে সংগঠনের ইতিহাসকে ভাগ করে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ ও যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক ২০১১-র পরবর্তী সময়ে প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগঠনের আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। যুগ্ম সম্পাদক গঠন পর্ব থেকে ২০১১-র পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। চিন্তন গোষ্ঠীর প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। □

সম্পাদকীয়

দৃষ্টিভঙ্গী ঃ স্বচ্ছতা বনাম অস্বচ্ছতা

আমজনতা বলতে যাদের বোঝানো হয়, তাদের নব্বই শতাংশই শ্রমিক ও কৃষক বর্গভুক্ত। খুব মোটা দাগে একথা বলা যেতেই পারে, যদিও কৃষকবর্গের মধ্যে যেমন স্তরভেদ রয়েছে, ঠিক তেমনই শ্রমিকবর্গও কোনো হোমোজিনিয়াস চরিত্রের নয়, বিভিন্নতা রয়েছে। কৃষকদের মধ্যে আপাতত ধনী কৃষককে আলোচনার বাইরে রাখলে, আরও যারা থাকে তারা হলো মাঝারি ও গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর, বর্গাদার প্রভৃতি। আবার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য পেশায় যুক্ত মানুষদেরও, আলোচনার সুবিধার্থে এই বর্গের মধ্যেই ধরে নেওয়া হলো। শ্রমিকবর্গেও সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রভিত্তিক একটা পার্থক্য যেমন রয়েছে, তেমনই সংগঠিত ক্ষেত্রেও সরকারী প্রতিষ্ঠান (যা এখনও আছে) ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, মজুরি বা বেতনের স্তরভেদ ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্পের সাথে যারা যুক্ত, তাদের সাথে অপরাপর অংশের শ্রমিকদের মানসিক গঠনের কিছুটা তারতম্য থাকে।

বহু ভাষা-ধর্ম-বর্ণের মানুষকে যেমন ভারতীয়ত্ব একসূত্রে গেঁথে রেখেছে, ঠিক তেমনই আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে অবস্থান অনুযায়ী এরা সকলেই কৃষক অথবা শ্রমিকবর্গভুক্ত। এদের সাধারণ চাহিদা কী? না, কোনো আকাশ-কুসুম কল্পনা বিলাসী এরা নয়, হওয়ার সুযোগও নেই। প্রদত্ত শ্রমের (কায়িক অথবা মানসিক) বিনিময়ে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি শর্ত পূরণই এদের চাহিদা বা দাবি। যারা কোনো না কোনো নিয়োগকর্তার অধীন, তাদের চাহিদা দ্বিধাবিভক্ত। চাহিদার একাংশ সরাসরি নিয়োগকর্তার কাছে, অপর অংশ সরকার বাহাদুরের (কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ত) কাছে। আর যারা স্বাধীন পেশায় যুক্ত, তাদের দাবি ও চাহিদার সবটাই সরকার বাহাদুরের কাছে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার গঠিত হয় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচনগুলিতে ভোট দেন যে নির্বাচকমণ্ডলী, খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সিংহভাগও, যাদের কথা এতক্ষণ বলা হলো, সেই শ্রমিক-কৃষক বর্গভুক্ত। স্বভাবতই নির্বাচনের আগে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীদের নিজের ও দলের হয়ে ভোট চাইতে শ্রমিক ও কৃষক পরিবারগুলির দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়। কারণ নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন ব্যতিরেকে, নির্বাচনে জয় তো সম্ভব নয়। তাই আমজনতার সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য ভাষণে, ইশতেহারে, গণমাধ্যম ও অধুনা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয় বহুবিধ প্রতিশ্রুতি। মেহনতী জনতার জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতির বহর দেখে আমজনতার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কোন রাজনৈতিক দল কোন শ্রেণীর প্রতি আসক্তি নিয়ে ক্ষমতায় বসতে চাইছে। শ্রেণী অর্থাৎ, একদিকে আমজনতা, অপরদিকে মুষ্টিমেয় সম্পদশালী মানুষ। দেশের সম্পদের সিংহভাগ যাদের কুক্ষিগত। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার করে আমরা এদের কুবেরও বলতে পারি। একটি দল, যাদের আসক্তি কুবের গোষ্ঠীর প্রতি, নির্বাচনের আগে যতই জনদরদী সেজে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ছোটাক না কেন, নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের পরে, অর্থাৎ আমজনতাকে বোকা বানিয়ে কেল্লা ফতে হলেই, কর্মসূচী সাজানো হয় প্রভু শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। অপরদিকে আর একটি দল, যাদের আদর্শগত কারণেই দায়বদ্ধতা মেহনতী অংশের প্রতি, তাদের প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনোত্তর গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে সাধারণভাবে কোনো পার্থক্য থাকে না। যদিও বা কিছু পার্থক্য থাকে, তা প্রায়োগিক স্তরে ত্রুটি বা রূপায়ণের পথে অনাকাঙ্খিত প্রতিবন্ধকতার কারণে।

সমস্যা হলো, শ্রেণি আসক্তির নিরিখে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার যে স্পষ্ট বিভাজন, গণমাধ্যম, যারা নির্বাচনের সময় তো বটেই, এমনকি ধারাবাহিকভাবে সমাজের অভ্যন্তরে জনমত গঠনের কাজটা করে, তারা কখনোই এই বিভাজনটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরে না। নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য, সব দলের সমালোচনা করার অছিলায়, সকলকেই 'এক গোয়ালের গরু' বানিয়ে ছাড়ে সংবাদমাধ্যম। অথচ সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া চাইলে, দক্ষিণ পন্থা ও বামপন্থার রাজনৈতিক অভিমুখের পার্থক্যটা সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারত এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বার বার প্রতারিত হওয়ার ঘটনাও ঘটতো না।

অবশ্য মিডিয়া যে চোখ খুলে দেখার কাজটা করবে না, সেটাই স্বাভাবিক কারণ, অধিকাংশ মিডিয়া হাউসের টিকি বাঁধা রয়েছে কুবের গোষ্ঠীর কাছে। ওদের পুঁজিতেই প্রতিপালিত হয়। সুতরাং প্রতিপালকদের মুখোশ খুলতে গেলে, ব্যবসাই লাটে উঠে যাবে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিগত কয়েক বছরের সর্বভারতীয় রাজনীতির মূল অভিমুখটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই, তৎকালীন ইউ পি এ-২ সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছিল। মিডিয়াও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল। একাধিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে ইউ পি এ-২ সরকারের বিদায় ছিল একরকম নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে নব্বই শতাংশ মানুষের সামনে একটা বিকল্প হাজির করা প্রয়োজন ছিল। মাত্রাতিরিক্ত প্রচারের সাহায্যে, তা করাও হলো। বিকল্প একজন ব্যক্তি ও একটি দল—নরেন্দ্র মোদী এবং বি জে পি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে জরুরি আলোচনাগুলি উত্থাপন করলে সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক বেশি নির্ভুল হতে পারত, তা করা হলো না। যেমন, (১) বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ইউ পি এ-১ সরকার এবং বামপন্থীদের সমর্থন ছাড়া গঠিত ইউ পি এ-২ সরকারের কার্যাবলীর যে পার্থক্য, তার মূল কারণ কী? কেন, 'এম এন রেগা' বা 'অরণ্যের অধিকার'-এর মতো আইন ইউ পি এ-১ সরকারের আমলেই প্রণীত হলো, ইউ পি এ-২ সরকারের আমলে তেমন কোনো আইনের দেখা পাওয়া গেল না। কেন? (২) যে দুর্নীতির কথা উঠে এলো বারে বারে, তা কি শুধুই কয়েকজন নেতা বা মন্ত্রীর চারিত্রিক ত্রুটির কারণে? নাকি নয়া উদারবাদী অর্থনীতিই এই ধরনের দুর্নীতির পসরা সাজিয়ে রেখেছে? (৩) বিকল্প হিসেবে যাঁকে হাজির করা হলো, সেই নরেন্দ্র মোদীর অতীত পরিচয় কী? তার মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে গুজরাটে সংখ্যালঘু জনগণের যে নৃশংস গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল, তখন প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তার ভূমিকা কী ছিল, (৪) তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন গুজরাটে একদিকে আদানি গোষ্ঠীর ফুলে ফেঁপে ওঠা, অপরদিকে মানব উন্নয়ন সূচকে ঐ রাজ্যের স্থান নেমে যাওয়ার কারণ কী? (৫) যে বি জে পি দলকে জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে হাজির করা হলো, তাদের আদর্শগত আনুগত্য কাদের প্রতি? (৬) বি জে পি-কে যারা পরিচালনা করে (এটা আদৌ কোনো গোপন বিষয় নয়) সেই আর এস এস-এর লক্ষ্য কী? (৭) তারা কি ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সমান অধিকার ইত্যাদি সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রনীতিগুলির সাথে একমত? এই জরুরি প্রশ্নগুলি হাজির করে যদি জনমত গঠনের পরিসর তৈরি করা হতো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হতো অনেক বেশি নির্ভুল। জরুরি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, ভিত্তিহীন কয়েকটি কথা প্রচারে তুলে আনা হলো।

প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতি, তিনি ছোটোবেলায় চা বিক্রি করেছেন, অর্থাৎ একেবারে সমাজের সাবঅলটার্ন অংশ থেকে উঠে এসেছেন (এখানেও সেই নব্বই শতাংশকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা, উনি তোমাদেরই লোক) ইত্যাদি। তথ্যের দিক থেকে এগুলি যদি সঠিক হয়ও (যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে), তাহলেও এর সাথে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। হিটলারও অতি সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসেছিল। তা বলে কি তার একনায়কতন্ত্রী শাসনে জার্মানির সাধারণ মানুষ সুখে ছিল?

যে আর এস এস স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে, প্রকাশ্যে সংবিধান ও ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকার বিরোধিতা করেছিল, সেই আর এস এস পরিচালিত বি জে পি-কে সরকার পরিচালনার উপযুক্ত শক্তি হিসেবে জনমানসে ধারণা তৈরি করে দেওয়া হলো। সংবিধানে সমস্ত সংখ্যালঘু অংশের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত হলেও একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাকেই হাজির করা হলো মসিহা হিসেবে। আরও একটি বিষয় হলো, সাম্প্রতিক অতীতেও যে এই দলটি কেন্দ্রে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল, এবং খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা নিরসনে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল, প্রচারের ঢক্কা নিনাদে তাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে, যেন একেবারে নতুন একটি দল এইভাবে হাজির করা হলো। ফল যা হবার তাই হয়েছে। প্রথম পাঁচ বছরে নোটবন্দী, অপরিকল্পিত জি এস টি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ডটা ভাঙার পর, এখন শুরু হয়েছে কৃষিবিল ও শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষক অর্থাৎ সমাজের নব্বই শতাংশের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ। বেসরকারীকরণসহ অন্যান্য প্রসঙ্গ তো আছেই। এই মুহূর্তে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মেহনতী মানুষ রাস্তায় নেমে লড়াই করছে। কিন্তু নির্বাচনের সময় এলেই দেখা যাবে, আবারও এগুলিকে আড়াল করার জন্য হয় বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আসা হবে, অথবা উগ্র জাতীয়তাবাদের ধুঁয়ো তোলা হবে। যেমন করা হয়েছিল প্রথম পাঁচ বছরের শেষে।

তাই বামপন্থায় বিশ্বাস করে এমন সকলের দায়িত্ব হলো সঠিক বিশ্লেষণসহ, প্রকৃত ইস্যুগুলিকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে স্থাপন করা। কাজটা কঠিন, কিন্তু এছাড়া রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোখার কোনো রাস্তা নেই। □

৫ অক্টোবর, ২০২০

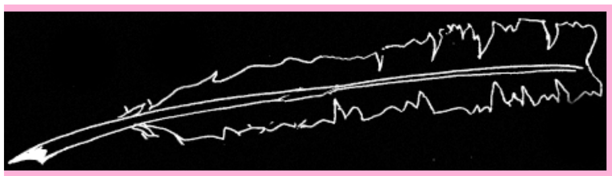

নয়া ধর্মনিরপেক্ষতা

'নয়া' শব্দটি অগ্রে বসাইয়া ভিন্নতর কোনো বিষয়কে অভিহিত করিবার পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া বলিতে হইলে 'নয়া'র পরিবর্তে 'নিও' অগ্রে অর্থাৎ প্রেফিক্সে বসাইয়া কাজ চালানো হয়। যেমন নয়া গণতন্ত্র বা নিও ডেমোক্রেসি, নয়া উদারবাদ বা নিও লিবারালিজম, নয়া ফ্যাসিবাদ বা নিও ফ্যাসিজম ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয় হইল, 'নয়া' যুক্ত করিয়া যে বিষয়গুলিকে বিধৃত করা হয়, সেইগুলি সমগোত্রীয় 'নয়া' বিযুক্ত বিষয়গুলি হইতে অনেকাংশে ভিন্নতর অর্থ বহন করিলেও, মূলগত দিক হইতে 'নয়া' যুক্ত এবং 'নয়া' বিযুক্ত, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

যেমন 'উদারবাদ' অতীতে (অ্যাডম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো) বাজার শক্তির পক্ষে সওয়াল করিত। নয়া উদারবাদও (মিল্টন ফ্রিডম্যান) বাজার শক্তির পক্ষেই সওয়াল করে। অর্থাৎ মৌলিক চরিত্রের নিরিখে এই দুইয়ের কোনো পার্থক্য নাই। ভিন্নতা হইল শুধুমাত্র বাজারের শক্তি সম্পর্কিত ধারণার মাপকাঠিতে। নয়া উদারবাদী মত হইল, বাজার স্বয়ম্ভু। আর সবকিছুই পরিচালিত হয় বাজারের মর্জি মাফিক। কিন্তু উদারবাদ বাজারের স্বাধীন ভূমিকার পক্ষে সওয়াল করিলেও, ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপেরও পক্ষপাতি। অর্থাৎ উদারবাদী নীতিতে বাজার স্বাধীন হইলেও স্বয়ম্ভু নয়। একই কথা প্রযোজ্য 'ফ্যাসিবাদ' ও নয়া ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রেও। ফ্যাসিবাদ (হিটলার, মুসোলিনি) যেরূপ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকেই ভাঙ্গিয়া, একনায়কতন্ত্রী শাসন কাঠামো নির্মাণ করিয়াছিল, নয়া ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে তদ্রূপ না ভাঙ্গিয়া, উহার অভ্যন্তরেই বাসা বাঁধিয়া, চরিত্রগত দিক হইতে 'একনায়কতন্ত্রী শাসন কায়েম করে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, মদীয় রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে দৃশ্যমান 'নয়া ধর্মনিরপেক্ষতা'-র স্বরূপ উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে কিন্তু হোঁচট খাইতে হইবে। কারণ এইক্ষেত্রে 'নয়া' বিযুক্ত ও 'নয়া' যুক্ত ধর্মনিরপেক্ষতা মূলগত দিক হইতেই পৃথক। কেন, তাহা বুঝিবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা, বহু চর্চিত হইলেও, পুনরুল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তথাপি আলোচনার পরিধিকে সীমায়িত রাখিবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য সংজ্ঞা লইয়া আলোচনা না করিয়া, মদীয় দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লিগ্যাসি বহন করিয়া, স্বাধীনতা উত্তরপর্বে ধর্মনিরপেক্ষতার যে সংজ্ঞাটি নির্মিত হইয়াছিল তাহার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাইতে পারে।

দেশজ ধর্মনিরপেক্ষতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হইল, রাষ্ট্র প্রতিটি ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করিবে, নাগরিকগণ এককভাবে অথবা যূথবদ্ধরূপে বাধাহীন পরিবেশে ধর্মাচরণ করিতে পারিবে, রাষ্ট্র নাগরিকবৃন্দের প্রতি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনোরূপ বৈষম্য করিবে না, ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষতার এহেন সংজ্ঞাটির কতিপয় দুর্বলতা থাকিলেও, বিশেষত ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার ভেদ রেখাটি সর্বদা স্পষ্ট না থাকিবার ফলে, একে অপরের স্কন্ধে চাপিয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিবার ঘটনা প্রায়শই প্রত্যক্ষগোচর হইলেও, মোটের উপর বহুধর্মের দেশে ইহা সকলকে সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে সফল হইয়াছিল। অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'সফল হইয়াছে' না বলিয়া 'সফল হইয়াছিল' বলা হইল। কারণ বিগত কতিপয় বৎসর যাবৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটির চরিত্র পরিবর্তন করিয়া ধর্মীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিবার রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি উক্ত প্রসঙ্গটি বর্তমানে উহ্য রাখিয়া 'নয়া ধর্মনিরপেক্ষতা' নামক বিষয়টি, যাহা ঘটমান বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতেছে, তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ নয়া ধর্মনিরপেক্ষতা নামক অত্যাশ্চর্য বিষয়টি, প্রকারান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী বিভিন্ন ধরণের মৌলবাদী শক্তিকেই উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বিশেষত, এমন এক সময়, যখন দেশব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষতার সমাধি খননের ব্যবস্থা হইতেছে, ঠিক তখনই রাজ্য সরকারের এদ্রূপ আচরণ ধর্মনিরপেক্ষার পীঠস্থান এই বঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার সমাধি খনকগণকে যারপরনাই উৎসাহিত ও উল্লসিত করিতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক---উল্লিখিত 'নয়া ধর্মনিরপেক্ষতা'-র স্বরূপটি কি? এক কথায় বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে, ইহার আচরণগত দৃশ্যমানতা যতখানি নির্বীষ, অন্তর্বস্তুগত দিক হইতে উহা ততখানিই ভয়ংকর। কেন ইহা বলা হইতেছে, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য দুই-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে। সংবিধানে ধর্মাচরণ করিবার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্মাচরণ গৃহকোণে অথবা ধর্মস্থানে, এককভাবে অথবা যূথবদ্ধরূপে প্রতিপালন করিবার প্রক্রিয়া আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ধর্মেই নির্দিষ্ট অনুশাসনের ভিত্তিতে ধর্মাচরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে, যাহা অনেকাংশে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষের নাগালের বাইরে। উক্ত অনুশাসনগুলিকে অনুসরণে যাঁহারা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করেন, তাঁহারাই পুরোহিত-ইমাম-পাদ্রী নামে সম্যক পরিচিত। অনুশাসন শিক্ষা দিবার বিনিময়ে, তাঁহারা পারিতোষিকও ভক্তকুলের নিকট গ্রহণ করেন। কাহারও ক্ষেত্রে ইহাই একমাত্র উপার্জনের উপায়, কাহারও ক্ষেত্রে অন্য পেশার সাথেই উপরি আয়ের মাধ্যম। কিন্তু সর্বক্ষণের অথবা 'পার্ট টাইম' যে চরিত্রেরই হউক না কেন, ইহার সহিত রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নাই। অতএব উক্ত পেশাজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার কোনো দায়ও সরকারের নাই। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হইল মদীয় রাজ্যে ঘটা করিয়া ইমাম ও পুরোহিতগণকে ভাতা দিবার প্রক্রিয়া চালু হইয়াছে। অথচ কর্মহীন যুবক-যুবতী, বন্ধ কারখানার শ্রমিক, যাঁহাদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তাঁহাদের কোনোরূপ ভাতা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্র অর্থাৎ রাজ্য সরকার গ্রহণ করিতেছে না। ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবিকার ব্যবস্থাপনা হইল ধর্মনিরপেক্ষতার নিদর্শন। আর সমস্ত ধর্মের যাজকবৃন্দকে তুষ্ট করিয়া ধর্মভীরু মানুষকে প্রভাবিত করিবার ফন্দী হইল 'নয়া ধর্মরনিপেক্ষতা'র অপকৌশল।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিও চিত্তাকর্ষক। শারদোৎসব পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট সর্ববৃহৎ উৎসব। ইহা ঠাকুরদালান হইতে বাহির করিয়া সর্বজনীন মঞ্চে উদ্‌যাপনের সূচনাপর্ব হইতেই সামাজিক উৎসবে পর্যবসিত হইলেও, ইহার কেন্দ্রে রহিয়াছে পূজা-অর্চনা তথা ধর্মাচরণ। স্বভাবতই সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ইহাতে রাষ্ট্র তথা সরকারের নাক গলাইবার কোনো সুযোগ নাই, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকার কেবলমাত্র সামাজিক উৎসব প্রতিপালনের জন্য নাগরিকবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধ সরকারের কর্তব্য। অতীতে বামফ্রন্ট সরকার যেরূপ ভূমিকা পালন করিত। কিন্তু 'নয়া ধর্মনিরপেক্ষতার' প্রবক্তারা চলিলেন ভিন্ন পথে। তাঁহারা সর্বজনীন শারদোৎসবের উদ্যোক্তাগণের হাতে 'অনুদান' তুলিয়া দিলেন উৎসব করিবার জন্য। যখন করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনজনিত কারণে নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকায় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিতেছে, তখন তাঁহাদের যন্ত্রণা নিরসনের পরিবর্তে, রাজ্য সরকার, সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া, উৎসব তথা ধর্মাচরণের পৃষ্ঠপোষকতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিল। এবংবিধ পদক্ষেপ উদ্দেশ্যবিহীন তো নয়ই, বরং চূড়ান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও সিংহভাগ মেহনতী জনতার তীব্র আর্থিক সংকটের কারণে, একদিকে যেমন প্রাক-উৎসব আবহাওয়া সম্পূর্ণতই নিরুত্তাপ, অপরদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের 'প্যানডেমিক' পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতা জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করিতেছে, যাহা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন রূপে রাজপথে প্রতিনিয়ত প্রদর্শিত হইতেছে। এই দুইয়ের অতিরিক্ত অপর একটি দিকও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। করোনা সংক্রমণের আবহেই কেন্দ্রীয় সরকার জনবিরোধী বিবিধ পদক্ষেপ দ্রুততার সহিত গ্রহণ করিতেছে। শারীরিক দূরত্ব বিধির ঘেরাটোপে আমজনতাকে বাঁধিয়া, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির সেবা করিবার এই মওকা তাহারা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে উন্মুখ। তাহাদের মতন ঢাক-ঢোল পিটাইয়া না হইলেও, রাজ্য সরকারও চুপিসারে কেন্দ্রকে অনুসরণ করিতেছে। কতিপয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নীতি লাগু করিবার বন্দোবস্ত অগ্রিমও করিয়া রাখিতেছে। স্বভাবতই আশু পরিষেবা প্রদানের ব্যর্থতার পাশাপাশি, জনগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ ঘোষণার গণপ্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে আঁচ করিয়া, তাহাকে অঙ্কুরেই দুর্বল করিবার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্রিম উৎসবের বুদবুদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। অর্থাৎ সর্বজনীন পূজা সমিতিগুলিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করিয়া একটি ঢিলে তিনটি পাখি মারিবার কৌশল গ্রহণ করা হইল রাজনৈতিক মুনাফা লুটিবার জন্য।

যাজকবৃন্দকে ভাতা প্রদান করিয়া ধর্মীয় মৌলবাদীগণকে খুশি করিবার আয়োজন এবং ধর্মীয় আচার পালন প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ হইল নয়া ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ।

সর্বোপরি সরকারী কোষাগার হইতে, সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া, দানসত্র খুলিবার পশ্চাতে একটি সুপ্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তাহা ইহল, সংঘগুলি সরকারী অনুদান গ্রহণ করিবার ফলে যে 'অবলিগেশন'-এ বাঁধা পড়িল, তাহার বিনিময়ে নির্বাচনের দিন, তাহাদের সদস্যবৃন্দকে বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোট মারিবার কাজে ব্যবহার করিতে সুবিধা হইবে। অতএব জয় নয়া ধর্মনিরপেক্ষতার জয়! □

৯ আশ্বিন, ১৪১৭

দেশের কৃষকদের গভীরতম সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে দিল কৃষি বিল

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

“রাষ্ট্র হলো শ্রেণি শোষণের যন্ত্র”—কার্ল মার্কসের সেই কালজয়ী উক্তিকেই আরেকবার সত্যি প্রমাণ করলো আমাদের দেশের সরকার। ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী আর. এস. এস পরিচালিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিপণ্যের বাণিজ্য, ফসলের দাম ও চুক্তি চাষ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ও কৃষি বাজার তুলে দেবার জন্য তিনটি অর্ডিনেন্স আগেই জারি করেছিল। এবার সেগুলিকে আইনে পরিণত করতে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই তিনটি বিল পেশ করে স্বৈরাচারী ও শ্রমিক-কৃষক বিরোধী এই সরকার। এই বিলগুলি হলো কৃষিক্ষেত্রকে বৃহৎ বাণিজ্যের সামনে উন্মুক্ত করে দেশের কৃষকদের জীবন ও জীবিকাকে গভীরতম সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত। কৃষকদের সাথে সাথে চরম সঙ্কটে পড়বেন দেশের সাধারণ মানুষও—বিশেষ করে খেটে খাওয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ। কারণ অত্যাবশকীয় পণ্যের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার ফলে ওইসব পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। ফলে দেশের জনগণের এক বিশাল অংশ অনাহারে বা আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হবেন। সংসদে এবং সংসদের বাইরে বিলগুলির জোরালো বিরোধিতা করেছে সবকটি বিরোধী দল এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের কিছু শরিকও। এমনকি এই বিলগুলির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগও করেছেন আকালি দলের মন্ত্রী হরসিমরাত কাউর। মোদী জমানায় এই প্রথম কোনো শরিক দলের মন্ত্রী সরাসরি সরকারী নীতির বিরোধিতা করে পদত্যাগ করলেন। এই বিলগুলি লোকসভায় পেশ হওয়ার সাথে সাথেই দেশব্যাপী কৃষকদের বিক্ষোভও শুরু হয়ে যায়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকরা রাস্তায় নেমেছেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কৃষকদের মিছিলকে রাজধানীতে ঢোকার মুখে পুলিশ আটকে দেয়। দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ দেখায় সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমিতি। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকরা মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেন। কিন্তু সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বিরোধীদের স্লোগান আর ওয়াকআউটের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় বিলগুলি পাশ করিয়ে নেয়। রাজ্যসভায় বিলগুলি পাশ করানোর আগে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবিও সরকার সর্বদলীয় বৈঠকে খারিজ করে দেয়। কৃষক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে লোকসভায় কৃষি সংক্রান্ত তিনটি বিল পাশ করিয়ে নেওয়ায় ফুঁসছে গোটা দেশ। করপোরেট স্বার্থবাহী আইন তৈরির অপচেষ্টায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যে রাজ্যে। সংসদে কৃষি বিল পাশের বিরুদ্ধে ২৫ সেপ্টেম্বর ‘সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস’-এর ডাক দেয় সারা ভারত কিষাণ সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। দেশের ২০০টিরও বেশি কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনকে নিয়ে তৈরি ওই সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে ওইদিন সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হন কৃষক ও খেতমজুররা। পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি বামপন্থী ও সহযোগী দলও ওইদিন কৃষক সংগঠনগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হন। শ্রমিক, কর্মচারী, মহিলা, শিক্ষক ও ছাত্র-যুব সংগঠনগুলিও কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন কর্মসূচী নিচ্ছে।

প্রথমে কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার কৃষিপণ্য বিল এবং দামের নিশ্চয়তা ও কৃষি পরিষেবা সংক্রান্ত কৃষক (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) বিল লোকসভায় পেশ করেন। এরপর খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাওসাহেব দানভে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিলটি পেশ করেন। বিলটির নামের সঙ্গে বিলটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃষিমন্ত্রী দাবি করেন যে এই বিলের সুবাদে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে আর কোনো বাধা থাকবে না। তিনি বলেন যে, কৃষকরা বিনিয়োগ করতে পারেন না, কিন্তু এই বিলের ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ আসবে এবং কৃষকরা বিনিয়োগকারী বেছে নিতে পারবেন। ৮৬ শতাংশ কৃষকের দু-হেক্টরের কম জমি রয়েছে এবং তাঁরা প্রায়ই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পান না। যদিও দেশব্যাপী চাপের ফলে কৃষিমন্ত্রী জানান যে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তুলে দেওয়া হবে না। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? নতুন আইনে তার তো কোনো সুযোগই নেই। কৃষি বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ফসলের ন্যায্য মূল্য হিসেবে খরচের দেড়গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে পাওয়া উচিত। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী বিজেপি-র নির্বাচনী ইশ্তেহারে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বসুরি কংগ্রেস সরকারের মতোই তিনি তা করেননি। দেড়গুণ তো দূরের কথা, বর্তমান ব্যবস্থায় যেটুকু সুযোগ কৃষকরা পেতেন তাও নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নেওয়া হলো কর্পোরেট ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, এই বিলের মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে পারবেন। কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে এই বিলটির মাধ্যমে কৃষিতে বৃহৎ বাণিজ্যের প্রবেশের রাস্তা সুগম করে দেওয়া হলো। এর সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের দাম ও সরবরাহের ওপর থেকে সব নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হবে। আন্তরাজ্য ও রাজ্যের অভ্যন্তরে অবাধ বিক্রির নামে যে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হচ্ছে তার মাধ্যমে কৃষি বাজার বা মান্ডির ভেতরে ও বাইরে চুক্তি চাষের পথ সুগম হবে। ইলেকট্রনিক ট্রেডিং-এর লাইসেন্স দেওয়ার ফলে সব কৃষিপণ্যের আগাম ফাটকা বাণিজ্যের পথ সুগম হবে। বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলি দেশের কৃষিপণ্যের বাজারগুলিতে অবাধ বাণিজ্য করতে পারবে। এর ফলে লাভবান হবে ফড়ে, ব্যবসায়ী ও আর্থিক মহাজনরা। তারা উৎপাদক কৃষক এবং ক্রেতা উভয়কেই শুষে নেবে। কৃষকের পক্ষে বিনিয়োগকারী বাছাই বা ফসলের ক্রেতা বাছাই আসলে অবাস্তব। বিশেষজ্ঞরা তা আগেই বলেছেন। সারা দেশের প্রচার মাধ্যমগুলির বেশিরভাগ অংশ প্রচার করছে যে নয়া আইনের ফলে কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসল যে কোনো ক্রেতাকে বা যেকোনো মুল্যে বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে যা হবে তা হলো কর্পোরেট সংস্থা বা ব্যবসায়ীরা কৃষকের থেকে যে কোনো মূল্যে ফসল কিনে নিতে পারবে।

লোকসভায় বিলগুলি পাশ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই কোনো ভোটাভুটি ছাড়াই রাজ্যসভায় কৃষি সংক্রান্ত দুটি বিল ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। কোনোরকম নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে বিরোধীদের আনা বিধিবদ্ধ প্রস্তাব বা সংশোধনীতেও মাথা গুনে ভোট করানো হয়নি। সরকার পক্ষ সংখ্যায় কম ছিল। ভোটাভুটি হলে তারা পরাস্ত হতো। বিল পাশ করানো যেত না। এই আশঙ্কাতেই রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন নিজের পদের অপব্যবহার করে ভোট নিতে অস্বীকার করেন। বিরোধীরা বার বার দাবি করা সত্ত্বেও ভোট নেওয়া হয় না। উল্টে ৩০ জন মার্শাল ডেকে বিরোধী সাংসদদের ঘিরে ধরে ও তাঁদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে তাঁদের কণ্ঠরোধ করা হয়। এইভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে তুমুল হইচইয়ের মধ্যে ধ্বনি ভোটে বিলগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। উপরন্তু কৃষি বিল পেশের প্রতিবাদ করার জন্য রাজ্যসভার আটজন সদস্যকে চলতি অধিবেশন থেকেই সাসপেন্ড করা হয়। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপারসন হরিবংশ যেভাবে সদস্যদের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন ও সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন করেছেন তার ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি বিরোধী দল অনাস্থার নোটিশ দেয়। সেই নোটিশও সংসদে আলোচনা করতে দেওয়া হয় না। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই দিনটি একটি কালো দিন এবং এই ঘটনা ভারতবর্ষের সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমনের এক জঘন্য উদাহরণ হয়ে রইলো। ভবিষ্যতে সংসদ হয়তো এভাবেই চলবে। সংসদীয় বিধি, সাংবিধানিক নিয়মকানুনকে পাত্তা দেওয়া হবে না। নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দল গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তিত নন। সাসপেন্ড হওয়া সদস্যরা কিন্তু প্রতিবাদের পথ থেকে সরেননি। সাসপেন্ড হওয়ার পরেও তাঁরা রাজ্যসভার কক্ষ ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন এবং প্রায় দিনভর কক্ষেই বসে থাকেন। অধিবেশন ঘন ঘন মূলতুবি করতে বাধ্য হন চেয়ারম্যান। পরে সাসপেন্ড হওয়া সদস্যদের সাথে বিরোধী সাংসদদের আরও অনেকে সংসদ ভবনের প্রাঙ্গণেই ধরনায় বসেন। তাঁদের হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল : ‘পার্লামেন্ট অ্যাসাসিনেটেড’ অর্থাৎ সংসদকে হত্যা করা হয়েছে। সারা রাত ধরনায় বসে থাকেন বিরোধীরা। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের কৃষি এবং কৃষককে ধ্বংস করার বিল এনেছে কেন্দ্র। কৃষি ব্যবসার পুরোটা কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বলে কিছু থাকবে না, ধসে যাবে গণবণ্টন ব্যবস্থা, এক শ্রেণির ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীর দাপট বাড়বে, দৈত্যাকার কর্পোরেটরা মজুত করে রাখবে শস্য। কৃত্রিম খাদ্যসঙ্কট এবং খাদ্যের আকাশছোঁয়া দাম নিশ্চিত করবে কেন্দ্রের এই বিল। দু-হাতে মুনাফা লুটবে দেশি-বিদেশী কর্পোরেট। সঙ্কট আরও বাড়বে কৃষকদের ও সব অংশের খেটে খাওয়া মানুষের।

সংবিধানে কৃষি রাজ্য তালিকাভুক্ত। বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি মান্ডি গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির আইন অনুযায়ী। কৃষি বিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার মান্ডি ব্যবস্থায় স্লো-পয়জনিং করতে চাইছে। কৃষি সংক্রান্ত নয়া আইন শেষ পর্যন্ত মান্ডি ব্যবস্থাটিকেই পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে কোনো কথা না বলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কৃষি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সগুলি অনুমোদন করেছিল। এই কাজ সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী। এখন আবার সংসদের উভয় কক্ষেই কৃষি সংক্রান্ত বিলগুলি এনে তা পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যের বিধানসভাগুলির অনুমোদনের জন্য সেগুলি না পাঠিয়েই। এককভাবে এই পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এই বিল একমাত্র রাজ্য সরকারই আনতে পারে। সুতরাং, রাজ্য সরকারগুলির অধিকার ও এক্তিয়ারেরও দখল নিতে চাইছে মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।

সংসদে কৃষি বিলের বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রের মোদী সরকারের পথ ধরে আগে থেকেই রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রকে বৃহৎ বাণিজ্যের সামনে খুলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অর্ডিনেন্স থেকে বিল পাশ হয়েছে সংসদে। কিন্তু তার আগেই ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেটিং (রেগুলেশন)’ নামক ১৯৭২ সালের আইনটিকে দুর্বল করে কৃষিক্ষেত্রকে খুলে দেওয়া হয়েছে কর্পোরেটদের কাছে। ইলেকট্রনিক ট্রেডিং লাইসেন্স দিয়ে কেন্দ্রের আইনকে লাগু করার পথ প্রশস্ত করে রাখা হয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজারকে গুটিয়ে কর্পোরেট সংস্থাকে কৃষি বাজার খোলার অনুমতি দিয়ে রাখা হয়েছে। রাজ্যের আইনকে পরিবর্তন করে, সরকারের নিয়ন্ত্রণে যেখানে মার্কেট কমিটি বা বোর্ড আছে সেই এলাকার ভেতরে ও বাইরে ব্যক্তি মালিকানায় কৃষি বাজার খোলার ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে রাজ্য। গত ১৮ মার্চ রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইনকেই অনুসরণ করা হয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাকে কৃষি বাজার খুলে দেওয়ার বিনিময়ে নামমাত্র লাইসেন্স ফি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতো পরিকাঠামো গড়ে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট সংস্থার জন্য খুলে দিয়ে এখন কৃষি বিলের বিরোধিতার নাটক করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভূতের মুখে রামনাম মানায় নাকি!

বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা, বিশেষ করে বামপন্থী ও কৃষক সংগঠনের নেতারা সংসদের ভেতরে এবং বাইরে এই বিলগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দেশে অতিমারিজনিত এক অন্ধকার পরিস্থিতি চলছে, যেখানে প্রতিবাদের পরিসর কম। কিন্তু ডাকাতি অন্ধকারেই হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের সঙ্গে ডাকাতিই করলো। এতে কৃষকদের সর্বনাশ হবে, ভারতীয় কৃষির সর্বনাশ হবে। কৃষিকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম তো পাবেনই না, উপরন্তু ফসল বেচার জন্য এবার তাঁদের নির্ভর করতে হবে বেসরকারী বাণিজ্য সংস্থার ওপরে। কৃষিবাজার বা মান্ডিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। দেশে প্রায় সাত হাজার কৃষি বাজারকে অকার্যকর করে দেওয়া হলো। কৃষি বাজার আইনে বরং একচেটিয়া কারবারের বদলে প্রতিযোগিতার সুযোগ ছিল। এখন কেন্দ্রীয় সরকার যা করলো তাতে কৃষক আর লাভজনক মূল্য পাবে না। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বাতিল করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হবে। মডেল চুক্তি চাষের আইন কৃষককে চিরকালের জন্য দাসে পরিণত করবে। বিজেপি সরকার কৃষিতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ও বেসরকারী ক্ষেত্রকে ডেকে এনে নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। যতই সীমায়িত হোক, স্বাধীন ভারতের সরকারগুলি এতদিন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে কৃষকদের সুরক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে খাদ্য নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। মোদী সরকারের আগ্রাসী নয়া উদারনীতি ব্রিটিশ আমলে দেশের কৃষকদের নির্মম শোষণের দিনগুলিকেই ফিরিয়ে আনবে।

কৃষি বিল পাশ করানোর জন্যে এত তাড়া কিসের? সম্ভবত বহু বাণিজ্যের চাপেই। গত কয়েক বছরে দেশের প্রতিটি আর্থিক ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিলেও কৃষিতে কিন্তু উৎপাদন বেড়েছে। তাই জিডিপি-তে যে ধস নেমেছে তার পরিত্রাতা হলো কৃষিপণ্য উৎপাদন। তাই দেশ-বিদেশের কর্পোরেট হাঙররা আর লোভ সামলাতে পারছে না। তারা এখনই ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে ঢুকতে চাইছে। এই কারণেই নরেন্দ্র মোদীর সরকার তড়িঘড়ি কৃষি বিল নিয়ে এল। দেশে এই অতিমারি চলাকালীন কৃষকদের পক্ষে প্রতিবাদের পরিসরও ছিল সীমিত। মানুষের এই অসহায়তার সুযোগ নিল দেশের সরকার। বিলগুলির মাধ্যমে কৃষিতে বৃহৎ বাণিজ্যের প্রবেশের রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তির ভিত্তিতে কৃষিতে নেমে পড়বে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। তাদের কাছ থেকে চড়া দরে কাঁচামাল কিনতে বাধ্য হবেন কৃষকরা। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের মূল্য এবং সরবরাহের ওপর থেকে সবরকম নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ফড়ে ও ব্যবসায়ীদের ফাটকায় কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি হবে। অত্যাবশ্যক পণ্য আইনে সংশোধন করার ফলে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, ভোজ্য তেল, তৈলবীজ যত ইচ্ছে মজুত করার ছাড়পত্র দেওয়া হলো। এখন থেকে আদানি, রিলায়েন্স-এর মতো কর্পোরেটরা যে কোনো পরিমাণ কৃষিপণ্য মজুত করতে পারবে—কোনো ঊর্ধ্বসীমা থাকছে না। তাদের খেয়ালখুশি মতো দাম নির্ধারণ করতে পারবে। কৃষকরা বাধ্য হবেন তাদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে, অন্যদিকে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। গণবণ্টন ব্যবস্থার যেটুকু এখনও রয়েছে, তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই কৃষকদের সাথে সাথে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ পথে নেমেছেন। বিক্ষোভ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবন-জীবিকা কৃষিনির্ভর। ফসলের দাম না পেয়ে এমনিতেই তাদের শোচনীয় অবস্থা। ঋণের বোঝায় তারা ন্যুব্জ। ফসল বিক্রি করে লাভ হয় না বলে ঋণও শোধ হয় না। অসহায় কৃষক তাই আত্মহত্যা করে মুক্তির পথ খোঁজেন। সেই কৃষকদের নতুন করে আরও সর্বস্রান্ত করে কর্পোরেট-বানিয়াদের পকেট ভরতে কৃষি বিল আনা হয়েছে। এই বিল কৃষকদের ভিক্ষুকে পরিণত করবে। ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক আত্মঘাতী হবেন। করোনা অতিমারির মধ্যে যখন প্রতিবাদ-বিরোধিতার পরিসর ক্ষীণ, ঠিক তখনই দেশে আইন এনে কৃষকদের পথে বসিয়ে দিনমজুর আর পরিযায়ী শ্রমিক বানানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। কৃষিপণ্যের বাজার পুরোপুরি দেশি-বিদেশী পুঁজির হাতে দিয়ে কৃষিতে বিনিয়োগের গল্প শোনানো হচ্ছে। কৃষি থেকে সরকার হাত তুলে দিয়ে বেসরকারী

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাম নাম সত্য হ্যায়

উৎসর্গ মিত্র

রত্নাকর ততদিনে বাল্মিকী মুনি হয়ে গেছেন। সনাতন ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী ততদিনে কিছু শিষ্যও জুটে গেছে তাঁর। এমনই একটা সময়ে একদিন প্রতিদিনকার অভ্যেস মতো তিনি চলেছেন ভোরবেলায় গঙ্গা স্নানে। সাথে তাঁর তল্পিবাহক হিসেবে আছেন নিত্যদিনের সঙ্গী ভরদ্বাজ। পথে পড়লো তমসা নদী। তমসার টলটলে জল দেখে মুনির সাধ হলো নদীতীরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সেখানেই সেদিনের স্নানটা সেরে নেবেন। মনোরম নদীতীরে বসে থাকার সময়ে মুনির চোখ চলে গেল এক ক্রৌঞ্চ মিথুনের দিকে। সুখী দম্পতির দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন সবে তাঁর ভাব এসে গেছে, এমন সময়ে সাক্ষাৎ শমনের মতো কোথা থেকে ছুটে এলো একটা তীর, সোজা গিয়ে বিঁধল পুরুষ পাখিটার বুকে, সাথে সাথে মৃত্যু হলো তার... স্ত্রী পাখিটাও সঙ্গীর সে মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে তীব্র আর্তনাদ করে প্রাণ হারাল। সুখী দম্পতির এ হেন মৃত্যু দর্শনে শোকাকুল বাল্মিকী এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন এক ব্যাধ কাঁধে তীর ধনুক নিয়ে এগিয়ে আসছে তার শিকারের দিকে। মুহূর্তে সবটা বুঝে নিয়ে তাঁর দু চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো... ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এলো অভিশাপ শ্লোকের আকারে,

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠানঃ ত্বগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমহিতম্"।।

—অসন্দিগ্ধ প্রেমরত ক্রৌঞ্চ দম্পতিকে হত্যা করার জন্য হে ব্যাধ, সারা জীবনে তুমি কোনো শান্তি পাবে না।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাল্মিকীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই শ্লোককেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক হিসেবে মনে করা হয় এবং সেই সূত্রে বাল্মিকীকে আদি কবির সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। পরে ব্রহ্মার পরামর্শে তিনি যখন 'রামায়ণ' রচনা করেন, তখন মহাকাব্যের রচনাকার হিসেবে তিনি অমর হয়ে যান।

'মা নিষাদ' যদি সংস্কৃত সাহিত্যের আদি শ্লোক হয়, তাহলে বলতে হবে যে সে শ্লোক রচিত হয়েছিল ভারতে বৈদিক যুগেরও আগে কারণ উপনিষদ সমেত সবক'টা গ্রন্থই শ্লোকের সমাহার। আবার বলা হয়ে থাকে রামের জন্মের আগেই নাকি রামায়ণ রচিত হয়েছিল এবং প্রবাদ অনুযায়ী রামের জন্ম যদি সত্যি সত্যিই সাত হাজার বছর আগে হয়ে থাকে তাহলে বাল্মিকীকে আরও প্রাচীন কেউ হতে হবে। কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা অঙ্কের। সাত হাজার বছর আগে মানে সেটাকে মানব সভ্যতায় ব্রোঞ্জ যুগেরও আগে অর্থাৎ নব্য প্রস্তর যুগের সময়ে হতে হয়। নব্য প্রস্তর যুগের যে সমস্ত নিদর্শন এখনও পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁজে পেয়েছেন, তার থেকে বোঝা যায় যে সেই সময়ে মানুষ সবেমাত্র পাথরের ভোঁতা অস্ত্রকে শান দিয়ে সূক্ষ করতে শিখেছে। এমন একটা সময়ে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের কথা অনুযায়ী রথও চলবে, রাম তীরও ছুঁড়বে, আকাশে পুষ্পক রথও উড়বে— এতো কিছু সত্যিই হজম করা কঠিন। দ্বিতীয় বিষয় হলো, রাম যদি সত্যিই বৈদিক যুগেরও আগের কেউ হবেন, তাহলে বেদ বা উপনিষদে তাঁর উল্লেখ থাকার কথা। কিন্তু চার বেদ এবং উপনিষদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও রামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী রামের জন্ম হয়েছিল কোশলের রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে। আমরা জানি কোশল প্রাচীন ভারতে ষোড়শ মহজনপদের এক অন্যতম মহাজনপদ ছিল এবং এই ষোলটা মহাজনপদই স্থাপিত হয়েছিল বৈদিক যুগের অনেক পরে প্রায় ৭০০-৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর তীর্থঙ্করের সম সময়ে (বৌদ্ধ শ্রমণদের অন্যতম প্রধান উৎস স্থল ছিল কোশল)। তাহলে রামের জন্ম অযোধ্যায় কি করে হলো? যে সময়ে অযোধ্যার অস্তিত্বই ছিল না, সে সময়ে তো রামের জন্ম সেখানে হতেই পারে না! আবার যদি ধরেই নিই যে সাত হাজার বছর আগে রামের জন্ম হয়েছিল বলাটা বাড়াবাড়ি, আসলে ওনার জন্ম অযোধ্যাতেই হয়েছিল, তাহলেও সমস্যা থেকে যায় কারণ রামায়ণেরই শেষ 'কাণ্ড' অর্থাৎ উত্তর কাণ্ডে দেখা যায় যে রামের দুই পুত্র লব আর কুশকে শিক্ষা দিচ্ছেন বাল্মিকী নিজে! তার মানে বাল্মিকীকে জীবিত থাকতে হচ্ছে পুরো বৈদিক যুগ পেরিয়ে অযোধ্যায় সময় পর্যন্ত। ইতিহাস বলে, এ দেশে আর্যরা এসে গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনো একসময়ে, তারপরে বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির সৃষ্টি। বাল্মিকীকে আদি কবি হতে গেলে তারও আগে জন্মাতে হয় এবং রামের ছেলেদের শিক্ষা দিতে গেলে সাত শো বছর বেঁচে থাকতে হয়—হজম করা বেশ মুশকিল।

এ যাবৎ খুঁজে পাওয়া রামায়ণের তিনশোর বেশি পাণ্ডুলিপি (সবগুলিই নাকি আসল বাল্মিকী রামায়ণ) নিয়ে বরোদার এম এস ইউনিভার্সিটি ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালায় শুধু মাত্র এটা বোঝার জন্যে যে সত্যি সত্যি রামায়ণের বয়স কত। বহু গবেষক এই কাজে প্রাণপাত পরিশ্রম করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আর যাই হোক রামায়ণ বৈদিক যুগের আগে তো নয়ই, এমনকি বৈদিক যুগেরও রচনা নয়, কারণ এর ভাষা বৈদিক যুগের থেকে একেবারে আলাদা— অনেক পরিশীলত। বৈদিক যুগে 'লক্ষ্মণ রেখা' ইত্যাদির মতো শব্দের ব্যবহার একেবারেই ছিল না। রামায়ণ রচিত হয়েছে পাণিনির ব্যাকরণ অনুসরণ করে, আর পাণিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের মাত্র শ'পাঁচেক বছর আগে। উপরন্তু রামায়ণে যে 'যবন'দের কথা বলা আছে, তা ভারতে গ্রীকদের আগমনের আগে থাকা সম্ভব না। তার মানে রামায়ণের বয়স আরও কমে গেল, কারণ আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন ৩২৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অর্থাৎ মৌর্য যুগে— তার আগে 'যবন' শব্দের সৃষ্টিই হয়নি। এই কারণেই বেদ বা উপনিষদে রামের কোনো উল্লেখ নেই, থাকা সম্ভবও ছিল না। সম্পূর্ণ রামায়ণ আসলে কোনো একজনের রচনা না, বেশ কিছু কাল ধরে বেশ কিছু লেখকের লেখা এতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে এখনকার চেহারা নিয়েছে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে রামায়ণের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিটি রচিত হয়েছিল মৌর্য যুগে, যখন 'অর্থশাস্ত্র' বা 'মনুস্মৃতি' রচিত হয়। 'অর্থশাস্ত্র', 'মনুস্মৃতি' এবং 'রামায়ণ'—তিনটিতেই সামাজিক নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে 'ধর্ম'কে, যা বেদে বা উপনিষদে কখনোই করা হয়নি।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, মৌর্য যুগে বা তৎপরবর্তী কালে বাল্মিকী নামে একজন মানুষ রামায়ণ নামে এক বৃহদাকার কাব্য রচনা করেছিলেন, যার সময়কাল রাখতে চেয়েছিলেন সাত হাজার বছর আগের, কিন্তু সেই সময়টা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার দরুণ কাহিনীর পরিবেশগত উপাদান থেকে গেছে তাঁর নিজের সময়ে অর্থাৎ মৌর্য যুগেই। এই কারণেই জন্মের সময়ে অযোধ্যার অস্তিত্ব না থাকলেও রামকে জন্মাতে হয়েছে সেই অযোধ্যাতেই। তবে এ ব্যাপারে বাল্মিকীকে 'মহা অপরাধী' গণ্য করা মোটেই সমীচিত হবে না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে তিনি কোন যুগে নিয়ে ফেলবেন, সেটা লেখক হিসেবে তাঁর স্বাধীনতা। বরং তাঁকে বাহবা দেওয়ার দরকার এই কারণে যে তাঁর রচনার প্রসাদ গুণেই রামায়ণ মানুষের মনে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে। তাঁর সৃষ্টির আবেগ এতটাই উচ্চ পর্যায়ের যে মহাভারতের সূক্ষ্মতা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঘটনাবলীর বিচার করা ছেড়ে দিয়ে তাকে 'বিশ্বাস' করতে চেয়েছে, কারণ একমাত্র বিশ্বাসের কাছেই কোনো যুক্তি খাটে না, যুক্তির দরকারও হয় না। আর এ কারণেই বাল্মিকীর কাব্যের চরিত্র রাম কারুর কাছে হয়ে উঠেছে স্বামী, কারুর কাছে শাসক আবার কারুর কাছে নিতান্তই ঘরের একজন আটপৌরে সন্তান—উপাদান বা ঘটনার পারম্পর্য সেখানে একেবারেই গৌণ। আদতে অপরাধ যদি কেউ করেই থাকে, তাহলে সেটা তারা, যারা রামকে 'ভগবান' বানিয়েছে—রামায়ণে বাল্মিকী নিজে সেটা কখনও করেননি। অপরাধী তারা, যারা সরল মনা ভারতীয়দের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক কাল্পনিক চরিত্রকে বাস্তবের জমিতে নামিয়ে এনে তাকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ফয়দা লোটার জন্যে। অপরাধী তারা, যারা কাব্যের নায়কের জন্মের সময়ের অযোধ্যাকে জোর করে তার জন্মের স্থান বানিয়ে তাণ্ডব চালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, কীভাবে মসজিদ ভাঙা হবে তার প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির এই ছবিগুলি ধরা পড়েছিল পায়োনিয়ার পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক প্রবীন জৈনের ক্যামেরায়। লালকৃষ্ণ আদবানী, অশোক সিংহল, উমা ভারতী প্রমুখের উপস্থিতিতে শাবল, হাতুড়ি, দড়ি নিয়ে সৌধ ভাঙার এই প্রশিক্ষণের ছবি তিনি জমা দিয়েছিলেন লখনৌ-এর বিশেষ আদালত এবং লিবেরহান কমিশনে।

উত্তর ভারতের মানুষ সেই ভাবে রামের পূজারী কোনো দিনই ছিল না। রাম তাদের কাছে ছিল আর পাঁচটা দেবতাদের মতোই একজন। বরং তারা পুজো করতো রামায়ণেরই আর এক চরিত্র হনুমানকে। রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী হনুমানের অমিত শারীরিক শক্তি এবং প্রভুর প্রতি তার অসীম অনুরাগের কারণেই হনুমান উত্তর ভারত, বিশেষ করে গোবলয়ের মানুষের কাছে বিশেষ আরাধ্য ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। হঠাৎ করে তার জায়গায় রামকে প্রতিষ্ঠিত করার বেজায় প্রচেষ্টা শুরু হলো গত শতকের শেষের দিক থেকে। 'হিন্দুত্ব'র নাম করে এক শ্রেণীর বর্বর মনা মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো অযোধ্যা। রামের জন্মের সময়ে যে অযোধ্যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সেই অযোধ্যাতেই চিহ্নিত হয়ে গেল রামের জন্মের জায়গা। সেখানেই নাকি জোর করে এক মসজিদ বানিয়ে ফেলা হয়েছে, সুতরাং সেই মসজিদ উপড়ে ফেলে তার জায়গায় ফের মন্দির বানিয়ে ফেলতে হবে। শুরু হয়ে গেল মানুষকে উত্তেজিত করার কাজ, শুরু হয়ে গেল এক বর্বর উন্মাদনা তৈরি করার জঘন্য প্রক্রিয়া।

১৫২৬ সালে পানিপথের যে যুদ্ধে জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবর জয়লাভ করে দিল্লীতে লোদী বংশের পতন ঘটিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপন করেন, সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী নিহত হয়েছিলেন। শোনা যায় ইব্রাহিমকে হত্যা করার 'মহান' কাজটি সম্পন্ন করেছিল মীর বাকি নামে বাবরেরই এক সেনাপতি। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ মীর বাকি অযোধ্যার জায়গির লাভ করে এবং কালক্রমে সে বাবরের বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ১৫২৮ সালে এই মীর বাকি বাবরের নির্দেশে তিনটি মসজিদ নির্মাণ করে ইন্দো-ইসলামিক গঠন শৈলীতে, একটি মোরাদাবাদের কাছে সম্ভল-এ, একটি পানিপথে এবং অপরটি অযোধ্যায়। প্রথম দুটি মসজিদ নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু অযোধ্যার সাথে যেহেতু রামের নাম জড়িয়ে আছে, সেহেতু এটি হয়ে উঠলো এক স্পর্শকাতর স্থান। যে রামকোট পাহাড়ের ওপর মসজিদ তৈরি হলো, সেখানেই নাকি রাম জন্মেছিল, সেখানেই নাকি এক মন্দির ছিল যা ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়েছে, সুতরাং এ এক গর্হিত অপরাধ। মজার কথা, এর ঠিক পরপরই ১৫৭৪ সালে লিখিত তুলসী দাসের (যিনি নাকি আসলে বাল্মিকীরই পুনর্জন্ম) 'রামচরিত মানস' কিম্বা ১৫৯৮ সালে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি'তে এই ধরনের ঘটনার কোনো উল্লেখই নেই, তবু সে ঘটনা নাকি ঘটেছিল! যাই হোক, সেই সময়ে এবং তার পরেও দীর্ঘকাল বাবরি মসজিদ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, উভয়েই সেখানে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে গেছে নির্বিঘ্নে।

বাবরি নিয়ে প্রথম বিরোধের ঘটনা ঘটে মসজিদ নির্মাণের অনেক পরে ১৮৫৩ সালে। অযোধ্যার নবাব তখন ওয়াজেদ আলি শাহ। প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী আবহাওয়ায় সে বিরোধ স্থায়ী হতে পারেনি। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পরে এবং ওয়াজেদ আলি শাহকে কলকাতায় নির্বাসনে পাঠানোর পরে ইংরেজরা মসজিদ চত্বরে বেড়া দিয়ে হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্যে উপাসনার জায়গা আলাদা করে দেয়। চত্বরের ভিতরের অংশ দেওয়া হয় মুসলমানদের আর বাইরের অংশ, যেখানে একটা চতুষ্কোণ অঞ্চল বা 'চবুতরা'কে রাম জন্মানোর জয়গা বলে ধরা হতো, দেওয়া হয় হিন্দুদেরকে। উভয়পক্ষই এই ব্যবস্থা খুশি মনে মেনে নিয়েছিল। ১৮৮৫ সালে মোহন্ত রঘুবর দাস নামে একজন ফৈজাবাদ জেলা আদালতে মামলা দায়ের করে ঐ চবুতরায় মন্দির নির্মাণের অনুমতি চায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা মাথায় রেখে আদালত তা নাকচ করে দেয়। ১৮৯৪ সালে শাহজাহানপুরে দাঙ্গা লাগলে তার আঁচ এসে পড়ে অযোধ্যায়। কিছু দুষ্কৃতি বাবরির পাঁচিলের ক্ষতি করে, কিন্তু সাথে সাথেই সরকারের তরফ থেকে তা সারিয়ে দেওয়ায় আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন ছিল।

১৯৪৪ সালে ভারতে ওয়াকফ বোর্ড ঘোষণা করে মসজিদ চত্বর মুসলমানদের সুন্নি সম্প্রদায়ের সম্পত্তি কারণ বাবর নিজে সুন্নি ছিলেন। এতে কোনো বিতর্কের জন্ম হয়নি কারণ সবাই মনে করেছিল এটি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এতে নাক না গলানোই ভালো। বিতর্ক বাধলো তার বছর পাঁচেক পরে, যখন দেখা গেল রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা মসজিদের মধ্যে রামের একটা মূর্তি বসিয়ে দিয়ে এসেছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার বাধ্য হলো পুরো অঞ্চলকেই 'বিতর্কিত' ঘোষণা করে তালা লাগিয়ে দিতে, নতুবা ফের দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারতো। পুরো চত্বরের 'দখল' নিতে পরের নয় বছরে অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে হিন্দুদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিশেষ করে 'নির্মোহী আখড়া' নামে এক জঙ্গি মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী অসংখ্য মামলা দায়ের করে, কিন্তু কোনোটারই নিষ্পত্তি হয়নি কোনো ভিত্তি না থাকায়।

এখানে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। গত শতকের বিশের দশকে যখন ভারতবর্ষ প্রবল ইংরেজ বিরোধী হাওয়ায় কাঁপছে, তখন নাগপুরে স্থাপিত হয় একটি সংগঠন, যার নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ বা সংক্ষেপে আর এস এস। ১৯২৫ সালের দশহরার দিন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন কেশব বলিরাম হেগড়েওয়ার নামে এক ডাক্তার। প্রবল মুসলিম বিরোধী এই ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখতেন ভারতবর্ষকে এক 'হিন্দু' রাষ্ট্র বানাবার। তা তিনি দেখতেই পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি ভক্ত হয়ে পড়েন দামোদর বিনায়ক সাভারকার নামে এক হীনচেতা মানুষের, যিনি নিজেই নিজেকে 'বীর' উপাধি দিয়েছিলেন এবং কোনো এক আন্দোলনের ঘটনায় ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে নতজানু হয়ে সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে সমস্ত সতীর্থদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে একদা বাংলায় অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসা হেগড়েওয়ারের যাবতীয় দর্শনেরও হীনত্ব প্রাপ্তি ঘটে এবং তাঁর কার্যকলাপ মুসলমান বিরোধিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশ থেকে ইংরেজ হঠানোর জায়গায় তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় দেশ থেকে মুসলমান তাড়ানো। হেগড়েওয়ারের পরে যিনি সংঘ পরিচালক হন, সেই মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর ছিলেন আরও এক কাঠি সরেস। তিনি আবার ছিলেন অনুগামীদের কাছে প্রধান তাত্ত্বিক নেতা। তাঁর লেখা বই 'বাঞ্চ অফ থটস' এখনও সংঘের সদস্যদের কাছে অবশ্য পাঠ্য। সেই বইতে তিনি খোলাখুলিই লিখেছিলেন যে তাঁর কাছে দেশের শত্রু ইংরেজরা নয়, বরং তিনি মনে করেন দেশের প্রধান শত্রু তিনটি— ধর্মীয় ভাবে মুসলমান আর ক্রিশ্চানরা এবং রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্টরা। মানসিকতার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই এখানে দরকার পড়ে না, কিন্তু তাঁর প্রভাবে পরিস্থিতি এমনই হয় যে ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই যখন আগামী স্বাধীন ভারতের জন্যে 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' বা সাংবিধানিক সভা বসে, তখন তার তীব্র বিরোধিতা করে আর এস এষ, এমনকি তারা ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকেও স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের দাবি ছিল ওই পতাকার জায়গায় শিবাজীর গেরুয়া রঙের 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা'কে স্বীকৃতি দিতে হবে, নতুবা কোনো হিন্দুই একে মেনে নেবে না। তাছাড়া 'তিন' সংখ্যাটা নিজেই যেহেতু অশুভ, সেহেতু যে দেশের পতাকার সাথে তিন সংখ্যাটা জড়িয়ে থাকবে, সে দেশের কিছুতেই মঙ্গল হতে পারে না। এখানেও আশা করি মানসিকতার ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হতে পারে না। ঘটনা হলো ১৯২৫ সালের পর থেকে দেশে যতগুলো সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, তার সব ক'টার পিছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর এস এস-এর হাত ছিল এবং আছে।

আর এস এস একটা কথা সঠিক ভাবেই বুঝেছিল যে শুধু মাত্র দাঙ্গা করেই তাদের স্বপ্নকে সফল করা যাবে না, সে কাজ করতে গেলে চাই রাজনৈতিক ভাবে দেশের দখল নেওয়া। সে কারণেই স্বাধীন ভারতে যে বছর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে তারা প্রতিষ্ঠা করে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন 'অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘ' বা সংক্ষেপে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' বা শুধু 'জনসঙ্ঘ'। ১৯৭৭ সালে প্রবল ইন্দিরা বিরোধী হাওয়ায় জনসঙ্ঘ জয়প্রকাশ নারায়ণের জনতা পার্টির সাথে মিশে যায়, কিন্তু আবার সুযোগ বুঝে বছর তিনেকের মধ্যেই জনতা পার্টির থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮০ সালে। নতুন এই দলের নাম হয় 'ভারতীয় জনতা পার্টি' বা বিজেপি। বলা বাহুল্য, পরিবর্তনের এই পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল মুখোশের আড়ালে ক্ষমতা বাড়ানোর কৌশল কারণ জনতা পার্টির সাথে মিশে যাওয়ার পরেও জনসঙ্ঘীদের কারও সাথেই আর এস এস-এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইতোমধ্যেই ১৯৬৪ সালে আর এস এস তৈরি করে ফেলেছিল তার আর একটি শাখা সংগঠন, বলা ভালো মানুষকে প্রকাশ্যে উসকানোর জন্যে তৈরি নাগরিক গুণ্ডাদের সংগঠন, যার নাম 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'।

জনসঙ্ঘ হোক বা বিজেপি, '৫২ সালের পর থেকে নির্বাচনগুলিতে তারা

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন ঐতিহ্যগত পরম্পরা ও বর্তমান বাস্তবতা

বিজয় শঙ্কর সিংহ

স্বাধীনতা উত্তর খণ্ডিত বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গ) রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা নিয়োগকর্তার দমনপীড়নমূলক নীতি, দাবিদাওয়া পূরণে রাজ্য সরকারের চরম অস্বীকৃতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, সেই আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই একটি পর্বে, যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ হিসেবে, ১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আমাদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আত্মপ্রকাশ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার অবিরাম স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলা শুরু হয়। যদিও প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষের অবিভক্ত বঙ্গে গঠিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনগুলি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, রাজ্য প্রশাসনের চরিত্র অনুধাবন করে, যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

যৌথ আন্দোলন নিষিদ্ধ করে রাজ্য সরকার ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ কালা সার্কুলার ৪৭৫-এফ প্রকাশ করে।

'৫০-এর দশক ছিল বামপন্থী শক্তি বৃদ্ধি ও উত্তোরণের একটা কালপর্ব। ১৯৫০ সালে প্রথম বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস জনিত বিপুল বৈষম্যের কারণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দুর্গতি বাড়তে থাকে।

এই সময় ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন, ১৯৫৩ সালে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে রাজভবনের সামনে শিক্ষকদের গণঅবস্থান কর্মসূচী, ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট খাদ্যের দাবিতে কলকাতায় কৃষকদের সমাবেশে পুলিশের লাঠিচার্জ ও ৮১ জন কৃষকের মৃত্যু হয়।

এই আন্দোলনের পরিবেশে পঞ্চাশের দশক থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে ব্যাঙ্ক, বীমা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ও রাজ্য স্তরের সংগঠনগুলি।

১৯৫৬ সালের ৯ জুন ৭টি সমিতি যৌথ আন্দোলনে যাবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। ১২ জুন ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা ও উৎসব বোনাসের দাবি পৃথক পৃথক ভাবে সমিতিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ২৪ আগস্ট ঘোষণা করেন ২৫ টাকা নয় ২ টাকা বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা Government Servant। তারা প্রার্থনা করবে, দাবি করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে ৮ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ২০টি সমিতির ২৫ হাজারের বেশি কর্মচারী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিধান রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং কর্মচারীরা ঘৃণাভরে সেই টাকা মানি অর্ডার মারফৎ ফেরত দেন। এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার জন্য ঐ সমাবেশের সভাপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় সহ ৬ জন কর্মচারী-নেতৃত্বকে সাসপেন্ড করা হয়।

১৯৬২ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার পূর্ণ সাংগঠনিক বিন্যাসসহ আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের পর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল ১৯৬৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের গণছুটির কর্মসূচী।

১৯৬৬ সালের ১২ জুলাই বাঁচার মতো বেতন চাই এবং সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের দাবিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা যুক্ত হয়ে শহীদ মিনার ময়দানে এক ঐতিহাসিক জমায়েতের মাধ্যমে গড়ে তুললেন ১২ই জুলাই কমিটি।

১৯৬৮ সালের ১৬ মে আট দফা দাবিতে যে প্রতীকী ধর্মঘট পালিত হয়েছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অর্ধশতাব্দীরও আগে সংগঠিত এই ধর্মঘটের শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিকতা আজও বিদ্যমান।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রথম পূর্ণাঙ্গ বেতন কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু কার্যকরী করার আগেই ষড়যন্ত্র করে সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়।

১৯৭০-এর পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতায় এলে সমস্ত দাবিদাওয়া অস্বীকৃত হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনের উপর মধ্যযুগীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মুখপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে, সত্তর দশকের গোড়ায় সীমাহীন সন্ত্রাসের মধ্যেও ১৯৭১ সালের ৭ মে আত্মপ্রকাশ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'। যা আগামী বছর (২০২১) নিরবিচ্ছিন্ন ভূমিকা পালনের পঞ্চাশতম বছর পূর্ণ করবে। যথোচিত মর্যাদায় প্রতিপালিত হবে সুবর্ণ জয়ন্তী।

৯ এপ্রিল, ১৯৭৪ সারা দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাথে পশ্চিমবাংলার কর্মচারীরাও ঐতিহাসিক ধর্মঘটে শামিল হলেন।

এত অত্যাচার, দমনপীড়ন, সন্ত্রাসের পর ১৯৭৭ সালে প্রকৃত জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী ৩৪ বছর অধিকার, মর্যাদা ও বহুবিধ দাবি অর্জনের এক উজ্জ্বল আখ্যান।

২০১১ সালে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে। এই সময় প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের সিংহভাগ বামফ্রন্টের আমলে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেই চাকুরী পেয়েছেন। এছাড়া অনেক কর্মচারী বামফ্রন্ট সময়কালের মধ্যে তাদের কর্মজীবন অতিক্রম করেছেন। স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের ১৯৭৭ সালের পূর্বের যে সরকার ছিল, প্রায় ৩০ বছরের কংগ্রেস সরকারের কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা, ১৯৭২-৭৭ রাজ্যজুড়ে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ও ভিন্ন চরিত্রের রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং সারা রাজ্যজুড়ে সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্ব সংগঠক কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

২০১১ সালের পূর্বেই নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের ঘটনা, ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনসহ একাধিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে রাজ্য পরিস্থিতির এক নেতিবাচক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়। যার প্রভাব পড়ে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে। রাজ্যের বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তিগুলির মদতে প্রশাসনের অভ্যন্তরে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা

ভুঁইফোড় কিছু সংগঠন সেই সময় প্রায় প্রতিদিনই মহাকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনে আন্দোলনের নামে ন্যাক্কারজনকভাবে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। বামফ্রন্ট সরকার টিফিনের সময় বা ব্যক্তিগত সময়ে আন্দোলন করার যে অধিকার দিয়েছিল তার অপব্যবহার করে অফিস চলাকালিন অন্য যে কোনো সময়ে পর্যন্ত বিশৃঙ্খল, অস্থিরতা তৈরি করত। বামফ্রন্ট সরকারের পাশাপাশি তাদের লক্ষ্য ছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই সময় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আর্থিক দাবি, অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে যে বিপুল সাফল্য এসেছে তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হল। এমনকি প্রতিটি দাবি অর্জনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তাকেও অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল।

একদিকে যখন প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলার বাতাবরণ, তখন অপরদিকে তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি কর্মচারীদের আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখাতে শুরু করল। আমাদের সংগঠনের সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনে সোনারপুর প্রকাশ্য জমায়েত কর্মসূচীর ঠিক পরে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় বিরোধী নেত্রী হিসাবে সোনারপুরেই কর্মচারী জমায়েত করে বলেছিলেন "আপনারা অর্ধেক বেতন পান, সরকারে এলে মহার্ঘভাতার স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ করা হবে, ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা দেওয়া হবে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় সমস্ত ধরনের ভাতা দেওয়া হবে প্রভৃতি একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে তাদের দলের ইস্তাহারে এইসব প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছিলেন। সারা রাজ্যজুড়ে মা মাটি মানুষের সরকার, সবার হাতে কাজ, সবার পেটে ভাত এইরকম একাধিক গালভরা শ্লোগান মানুষের কাছে হাজির করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি ছিল মিডিয়ার সন্ত্রাস। যার ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও কর্মচারী সমাজ বিভ্রান্ত হয়েছিল। প্রশাসনের অভ্যন্তরে ও রাজ্যজুড়ে এইরকম বিভ্রান্তিকর পরিবেশে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার জন্মলগ্ন থেকেই সরকারের চরিত্র বিচার করে তার কর্মসূচী রূপায়ণে আন্তরিকতা, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও কর্মচারীদের সম্পর্কে দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির ভিত্তিতে। কোনো পতাকার রঙ দেখে না। এভাবেই সংগঠন অতীতে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পরবর্তীতে ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করেছে।

তাই ২০১১ সালে যখন বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাকরণে সব কর্মচারীদের সংগঠনগুলিকে নিয়ে সভা ডাকা হয়, তখন আমাদের সংগঠন সেই সভায় হাজির ছিল। আমরা বলেছিলাম যে, সরকার জনমুখীন কর্মসূচী নিলে তা কার্যকরী করতে আমাদের সংগঠন একশো শতাংশ সহযোগিতা ও দায়িত্ব পালন করবে। যদি জনবিরোধী কর্মসূচী নেওয়া হয় বা কর্মচারীদের আর্থিক বা অধিকারগত দাবি নিয়ে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা লড়াই করব। কর্মচারী স্বার্থে প্রয়োজনে রাস্তাতে লড়াই করব। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজ্যের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও কর্মচারী ও তার পরিবারের স্বার্থে আমাদের বক্তব্য বলা হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০১১ সালের পরবর্তী সময় উল্লেখ করার আগে বিগত ৩৪ বছরের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মধারা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ, মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার অর্জিত হয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত অর্থাৎ গ্রামের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শহরাঞ্চলে ১২৭টি পৌরসভা ও অনেকগুলি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছিল। অর্থাৎ শহর, আধা শহর ও গ্রামের সাধারণ মানুষ সার্বিক পরিষেবা পেয়েছে। বাজেটের ৫০ শতাংশ ব্যয় হতো এই স্থানীয় প্রশাসনগুলির মাধ্যমে। এই ব্যাপক পরিষেবার কাজে লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হয়েছিল। এছাড়া কৃষিতে উন্নতি, বর্গা প্রথার আইনানুগ স্বীকৃতিতে ২৯ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল। প্রশাসনের অভ্যন্তরে শিক্ষক মহাশয় ও সরকারী কর্মচারীরা যোগ্য সম্মান পেয়েছিলেন, যা নজিরবিহীন ছিল। আজ রাজ্যের সাধারণ গরীব মানুষ, শিক্ষক মহাশয় ও কর্মচারী সমাজ পরিবর্তনের ফল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। শুধু তাই নয়, যারা আমাদের শত্রু মনে করেন তারাও অস্বীকার করতে পারছেন না।

কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার আইনি স্বীকৃতি, বছরে দুটি কিস্তি মহার্ঘভাতা, কোনো কোনো বছরে আবার তিন কিস্তি মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্বে বকেয়া ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতার মধ্যে ১০ শতাংশ ভোট অন এ্যাকাউন্ট বাজেটে বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ ৬ শতাংশ বকেয়া ছিল। ৪টি বেতন কমিশন কার্যকরী হয়েছিল, ভ্রমণ ভাতা চালু করা হয়েছিল, তিন বছর চাকুরী হলেই স্থায়ীকরণ করা হতো। এছাড়াও ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট বেনিফিট (প্রথম ১০/২০ পরে ৮/১৬/২৫) চালু হয়, যা কোনো রাজ্যে নেই। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্যাডারের সার্বিক সুবিধার প্রশ্নে একাধিক আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া W.B. Health Scheme-2008 নজিরবিহীন সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের নজির।

২০১১ সাল থেকে বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যের গণতন্ত্র আক্রান্ত ও বিপন্ন। ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার দখল, দৈহিক আক্রমণ, পরিবারকে হুমকি, তোলা আদায় ও রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু হয়। সারা রাজ্যজুড়ে এখন সন্ত্রাস ও লুম্পেন রাজ চলছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার আক্রান্ত, রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী সমাজ আজ আক্রান্ত। ৩৪ বছরে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা আজ বিপন্ন।

রাজ্যে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কুটির-মাঝারি শিল্প সহ সব ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। মানুষের দুর্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চায়েত, পৌরসভা সহ সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। বর্তমানে বিশেষ করে সারা বিশ্বজুড়ে, আমাদের দেশে ও রাজ্যে অতিমারি করোনা সংক্রমণের যেভাবে বৃদ্ধি ঘটছে তাতে দেশের ও রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। ত্রাণ বণ্টন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।

এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ও কর্মচারীদের স্বার্থে আমরা ধারাবাহিকভাবে লড়াই সংগ্রাম করছি। এছাড়া এরকম করোনা অতিমারি সংক্রমণে আমরা বার্তা দিয়েছি, আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যজুড়ে মানুষের পাশে, মানুষের সাথে থাকার লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানানো হয়েছিল। লকডাউনের মধ্যে সংগঠনের কর্মী সংগঠক নেতৃত্ব ও প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ভয়কে জয় করেই যেভাবে তহবিল সংগ্রহ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করেছে তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। সারা রাজ্যে প্রান্তিক অসহায় প্রায় ১৮০০০ পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী ও প্রায় ১২০০০ মানুষকে কমিউনিটি কিচেনে রান্না করে খাবার খাওয়ানো হয়েছে, এছাড়া আমফানে বিধ্বস্ত দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। লকডাউনের মধ্যেই মুমূর্ষু রোগীকে প্রায় ৭০ জন রক্ত দিয়েছেন, কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে রক্তদান শিবির হয়েছে। অনুরূপভাবে জেলায় রক্তদান শিবির হচ্ছে। পাহাড়প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে সংগঠনের আহ্বানে কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যেভাবে তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিতে অস্বীকার করছে। মহার্ঘভাতা বিহীন ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন চালু করেছে এরিয়ার ছাড়া, ১৫ শতাংশ বাড়িভাতা কমিয়ে ১২ শতাংশ করেছে, ২.৫৭ ম্যাট্রিক্স সবক্ষেত্রে মানা হয়নি, ২০১৬-এর পূর্বে অবসরপ্রাপ্তদের ফিটমেন্ট ওয়েটেজ দেওয়া হয়নি। এছাড়া বর্তমানে (১৭+৪) = ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রয়েছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দুই লক্ষাধিক পদ শূন্য, এছাড়া শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বোর্ড ও কর্পোরেশনের কর্মচারীদের নিয়ে প্রায় ৩$^{১}/_{২}$ লক্ষ পদ শূন্য পড়ে আছে। রাজ্যে শিল্প হচ্ছে না, যা আছে বন্ধ হচ্ছে। ঐসব শূন্যপদ পূরণ হলে যুবক-যুবতীরা চাকরি পেতে পারে। আমাদের সংগঠন শূন্যপদ পূরণ, চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীদের মতো বেতন ও সুযোগ সুবিধা প্রদান, বাধ্যতামূলক অবসর করানো চলবে না, প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলি ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্যকর্মী যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রদান করার দাবি উত্থাপন করেছে।

২০১১ সালের পর থেকে আমাদের সংগঠন তিনবার নবান্ন ও বিকাশ ভবন অভিযান করেছে এবং একাধিকবার মিছিল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত কর্মচারীদের নিয়ে যৌথ আন্দোলন এই সময়কালে সংগঠিত হয়েছে।

সংগঠনের নবান্ন অভিযানের পর সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকসহ ১৫ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের গ্রেপ্তার করা সহ দার্জিলিং, কালিম্পং ও মুর্শিদাবাদে বদলি করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও লড়াই আন্দোলন সংগ্রাম জারি আছে, থাকবে। ধর্মঘট হয়েছে। একাধিকবার ডায়াস-নন, বেতন কাটা সত্ত্বেও কর্মীরা ধর্মঘট করেছেন শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেই ধর্মঘটীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই বর্তমান করোনা মহামারি সংক্রমণ-এর বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সংগঠনের আহ্বানে প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে রত থেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। আমাদের সামনে লড়াই ছাড়া শর্টকাট কোনো পথ নেই, এ কথা কর্মচারীদের কাছে দৃঢ়তার সাথে প্রচার করতে হবে। এছাড়া আগামীদিনে বকেয়া ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও পাহাড়প্রমাণ আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার প্রতিবাদে অবশ্যম্ভাবী লড়াইতে সব অংশের কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেই, কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষে যাওয়ার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

রাম নাম সত্য হ্যায়

মোটামুটি সংখ্যার আসন পেয়ে আসছিল, কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে গেল ১৯৮৪ সালে। সে বছর ইন্দিরা হত্যাজনিত প্রবল সহানুভূতির হাওয়ায় খড় কুটোর মতো উড়ে গিয়ে বিজেপি পেল মাত্র দুটি আসন। সঙ্ঘের নেতারা প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁদের কাছে এমন রাজনৈতিক পুঁজি নেই, যার মধ্যে দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, কারণ রাজনৈতিক ভাবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তখন তলানিতে। সুতরাং এমন কিছু একটা করা দরকার, যাতে তাদের দিকে ফিরে আসার জন্যে মানুষের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করা যায়। তাদের কাছে ধর্মের পুরনো তাস ছিল, তারা সেটাই তখন খেলতে আরম্ভ করলো। শুরু হয়ে গেল ফের অযোধ্যায় আনাগোনা। কল্পনার রাম চলে এলো বাস্তবের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। সুর চড়াতে লাগলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সাথে সঙ্গত দিতে থাকলো আর এস এস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ও আর এক শাখা সংগঠন 'বজরং দল'। দেশ পরিচালনায় ইন্দিরা তনয় রাজীব গান্ধীর দুর্বলতার সুযোগে অবাধে চলতে লাগল সঙ্ঘ পরিবারের মৌলবাদী কার্যকলাপ। সমাজে তৈরি হতে থাকলো অশুভ উন্মাদনা, শক্তি বাড়তে থাকলো আর এস এস-এর, আসন বাড়তে থাকলো বিজেপির।

সময়টা তখন ১৯৮৯। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, দেশের উপ-প্রধান মন্ত্রী বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি। ততদিনে লোকসভায় বিজেপির আসন বেড়ে হয়েছে ৮৫, দেশের চারটে রাজ্যের শাসন তাদের দখলে। ততদিনে প্রাক্তন ভি এইচ পি নেতা দেওকি নন্দন আগরওয়ালাকে দিয়ে অযোধ্যায় বিতর্কিত জমির দখল চেয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চে মামলা দায়ের করানো হয়ে গেছে। অযোধ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার দায়িত্ব তখন হাই কোর্টের স্পেশাল বেঞ্চের উপর, তা সত্ত্বেও চাপ বাড়ানোর জন্যে ভি এইচ পি নেতাদের দিয়ে জমির ঠিক বাইরেই করিয়ে দেওয়া হলো রাম মন্দিরের শিলান্যাস। ক্ষমতা দখলে মরিয়া আর এস এস এবারে নির্দেশ দিল সমাজে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। ১৯৯০-এর ২৫ সেপ্টেম্বর গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে দেশের উপ-প্রধান মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি সমস্ত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন 'রথ যাত্রা'য়। রাম মন্দির তৈরি করতে দিতেই হবে এবং অযোধ্যাতেই দিতে হবে। আইন যদি সে কাজ করতে দেয় ভালো, না হলে গায়ের জোরেই সে কাজ করা হবে। ভাবা যায়, দেশের উপ-প্রধান মন্ত্রী সরাসরি আইন ভাঙার ডাক দিচ্ছে! কিন্তু সেটাই হয়েছিল সেদিন। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করল, তারা রথকে রাজ্যে ঢুকতেই দেবে না এবং আর জে ডি পরিচালিত বিহারের লালু প্রসাদের সরকার ঘোষণা করল যে, সে রাজ্যে রথ ঢুকলেই আদবানিকে গ্রেপ্তার করা হবে। কারণ দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী হলেও তিনি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। বাস্তবে হলোও তাই। বিহারে গ্রেপ্তার হলেন আদবানি। আর এস এস এটাই চাইছিল। বি জে পি ভিপি সিং সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ায় সে সরকারের পতন ঘটলো। কয়েকদিনের জন্যে চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হলেন বটে, কিন্তু তিনিও বেশিদিন চালাতে পারলেন না, ফলে নির্বাচন অনিবার্য হয়ে উঠলো।

এত করেও শেষরক্ষা হলো না বিজেপির। ১৯৯১ সালে নরসিমা রাওয়ের সংখ্যালঘু সরকার বামপন্থীদের সমর্থনে শপথ নিল। বোঝা গেল কেন গোলওয়ালকর কমিউনিস্টদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু মরিয়া সঙ্ঘ পরিবার এবারে তাদের সবচেয়ে মারাত্মক তাসটা খেলে দিল ১৯৯২ সালে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন বিজেপিরই কল্যাণ সিং। সেই সুযোগে ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় সারা দেশ থেকে দুষ্কৃতি জড়ো করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ কাল্পনিক এক চরিত্রের দোহাই দিয়ে। মঞ্চে তখন সঙ্ঘ পরিবারের তাবড় নেতারা। কারো মুখে হাসি, কারো চোখে আনন্দাশ্রু, কেউ বা তখন আনন্দে অন্য কারো ঘাড়ে চেপে নাচছেন। পুলিশ চুপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও চুপ। কমিউনিস্টরা বারে বারে ফোন করে তাঁকে আর্জি জানাচ্ছেন দ্রুত অযোধ্যায় সেনা পাঠাতে, তিনি তখন ভাত ঘুমে। এ যেন মহাভারতের পাশা খেলার পরের দৃশ্য। ধৃতরাষ্ট্র—চুপ! ভীষ্ম—চুপ! বিদুর—চুপ... একা বিকর্ণ আটকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে আর সমবেত হাহা রবে চলতে থাকছে দ্রৌপদির বস্ত্র হরণ পর্ব। দিনের শেষে মাটিতে মিশে গেল ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন বাবরি মসজিদ। সবকিছু সারা হলে চাপে পড়ে তৈরি হলো লিবেরহান কমিশন সমস্ত ঘটনার 'তদন্ত' করতে।

তারপরের দু'বছরের ইতিহাস আসলে দেশে দাঙ্গা তৈরির ইতিহাস। এই দাঙ্গার উপর ভর করেই প্রথমে ১৯৯৬ সালে তের দিনের জন্যে, ১৯৯৮ সালে তের মাসের জন্যে এবং ১৯৯৯ সালে পুরো পাঁচ বছরের জন্যে দিল্লী দখল করতে পারলো বিজেপি। যে বছর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করতে শত্রুঘ্ন সিংহর নেতৃত্বে কমিটি তৈরি করলেন, সেই বছরেই অর্থাৎ ২০০২ সালে ঘটে গেল গুজরাটে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনে পরিকল্পিত মুসলিম গণহত্যা পর্ব। এদিকে লিবেরহান কমিশনের কাজ চলছেই আবার এর পাশাপাশি সঙ্ঘের লক্ষ্যকে পাকাপাকি ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে একের পর এক চলছে সরকারি মদতে ইতিহাস বদলের কাজ, ইতিহাস মুছে ফেলে দেওয়ার কাজ। বাবরি মসজিদকে নিয়ে আসা হচ্ছে বাচ্চাদের সিলবাসে যাতে ছোটো থেকেই তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পুঁতে দেওয়া যায়। এদিকে কোর্ট জি এস আই-কে অযোধ্যায় মাটি খুঁড়ে মন্দিরের নিদর্শন আছে কি না খুঁজে দেখতে বলে। কারণ, শুধুমাত্র 'বিশ্বাস'-এর উপর নির্ভর করে আদালত তার রায় দিতে পারে না, তার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ দরকার বিচার করার জন্যে। বলা বাহুল্য, সরকারের আস্থাভাজন লোকেরাই এই খনন কার্য শুরু করে এবং কি আশ্চর্য, তারা মন্দিরের বেশ কিছু টুকরো খুঁজে পেয়েও যায়। বিশেষজ্ঞরা বললেন সেগুলি বেশ নতুন, কিন্তু সেসবে কর্ণপাত না করে সরকারি ভাবেই নথিবদ্ধ হয়ে গেল মন্দিরের টুকরো পাওয়ার কথা।

২০০৯ সালে প্রাপ্ত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে লিবেরহান কমিশন তার রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয়। দেশে তখন কংগ্রেস সরকার। ২০১০ সালে এক অন্তর্বর্তী রায়ে অযোধ্যায় বিতর্কিত জমিকে তিন ভাগ করে এক ভাগ রাম লালার বকলমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে, এক ভাগ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে এবং আর এক ভাগ নির্মোহী আখড়াকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। রায়ের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী রায়কে নাকচ করে দেয়। দেখতে দেখতে চলে আসে নির্বাচন এবং সে নির্বাচনে ফের জয়ী হয় বি জে পি। এবারে লোকসভায় তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ, এবারে লোকসভায় বামপন্থীদের আসন সংখ্যা মাত্র ১১ এবং এবারে প্রধানমন্ত্রী ২০০২ সালে মুসলিম গণহত্যা চলাকালীন গুজরাটের সেই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যাঁর 'পারফরমেন্সে' 'ব্যথিত' হয়ে একদিন চোখের জল ফেলে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কাব্যি করে তাঁকে 'রাজধর্ম' পালন করতে বলেছিলেন।

২০১৭ সালেই দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয় যে অযোধ্যায় বিতর্কিত জমির দখল কে পাবে, সেটা পৃথক বিষয়, কিন্তু সেখানে বাবরি মসজিদ ধ্বংস আসলে এক ষড়যন্ত্রেরই অংশ এবং সেই সেই ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর জোশী, উমা ভারতী ইত্যাদিদের বিরুদ্ধে মামলা কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না, এর পুনর্বিচার করতে হবে। শীর্ষ আদালত এলাহাবাদ হাই কোর্টের লখনৌ বেঞ্চকে নির্দেশ দেয় দুই বছরের মধ্যে শুনানি শেষ করে তার রায় জানিয়ে দিতে। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সুপ্রিম কোর্টে বাবরি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলা চলাকালীনই ভি এইচ পি এই মামলার সাথে আরও কিছু মামলা জুড়ে দিয়ে আবদার করতে থাকে তিন সদস্যের বেঞ্চের পরিবর্তে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে মামলা স্থানান্তর করার জন্য। অক্টোবরে কোর্ট সে আবদান খারিজ করে জানিয়ে দেয় যে শুনানি তিন সদস্যের বেঞ্চেই হবে এবং সবক'টা মামলাকে জুড়ে দিয়ে সে শুনানি শুরু হবে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে।

সাল ২০১৯। বাবরি নিয়ে দ্রুত পর পর ঘটনা ঘটে যাওয়ার বছর। জানুয়ারি মাসে আচমকাই দেশের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ঘোষণা করে দেন যে শুনানি তিন সদস্যের বেঞ্চে নয়, হবে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে। গঠিত হলো প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে এস এ বোবদে, এন ভি রামান্না, ইউ ইউ ললিত এবং ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। এর মধ্যে কিছু একটা সন্দেহ করে বিচারপতি ললিত নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। দিন কয়েকের মধ্যেই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তৈরি হয়ে যায় নতুন বেঞ্চ এবং কী আশ্চর্য, একজনের পরিবর্তে সেখানে স্থান পান নতুন দুই জন সদস্য যথাক্রমে অশোক ভূষণ এবং এস এ নাজির, ললিতের সাথে বাদ পড়েন বিচারপতি রামান্নাও। দেশে সাধারণ নির্বাচন তখন একেবারে দোরগোড়ায়। এর মধ্যেই সরকার অযোধ্যায় বিতর্কিত জমির সাথে অধিগৃহীত ৬৭ একর জমি তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতের অনুমতি চায় এবং নির্মোহী আখড়ার আপত্তি সত্ত্বেও আদালত সে অনুমতি সরকারকে দিয়েও দেয়। পাশাপাশি আদালত সমস্যার সমাধানের জন্যে এক মধ্যস্থতাকারী টিমের মেয়াদ ১৫ আগস্ট অবধি বাড়িয়ে দেয়। ৩০ মে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণ করেন। এবারে বিজেপির আসন সংখ্যা আরও বেশি এবং বামপন্থীদের আসন মাত্র পাঁচ। ১ আগস্ট মধ্যস্থতাকারী টিম তাদের রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতে জমা দেয় এবং পরদিন থেকেই সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় বাবরি নিয়ে রোজ শুনানির কাজ।

৪ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, বাবরি নিয়ে যাবতীয় মামলার রায় ঘোষণা হবে ১৭ নভেম্বর। ১৬ অক্টোবর শেষ হয় শুনানির কাজ এবং আবারও অদ্ভুতভাবে আগের ঘোষণার থেকে সরে গিয়ে আদালত রায় ঘোষণা করে দেয় ১৭ নভেম্বরের অনেক আগে নভেম্বর মাসের ৯ তারিখেই। রায় ঘোষণার পুরো অনুষ্ঠানটাই সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল সংবাদ মাধ্যমের পর্দায়। সারা ভারত দম বন্ধ করে শুনেছিল সে রায় ঘোষণা। বেঞ্চের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈই ঘোষণা করেন সে রায়। ১০৪৫ পাতার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করে নেন যে রামের জন্ম যে ঠিক ঐ বিতর্কিত স্থানেই হয়েছিল, এমন প্রমাণ আদালতের কাছে নেই। স্বীকার করে নেন যে রাম আদৌ জন্মেছিলেন কিনা এমন প্রমাণও যথেষ্ট ভাবে আদালতের কাছে নেই। কিন্তু ভারতের বেশিরভাগ মানুষ 'বিশ্বাস' করেন যে ঠিক ঐ স্থানেই 'ভগবান' রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যেহেতু মানুষের 'বিশ্বাস'এর জন্ম বাবরি মসজিদ স্থাপনের অনেক আগে থেকে, তাই এই জমিতে হিন্দুদেরই অধিকার (It is thus concluded on the conclusion that faith and belief of Hindus since prior to construction of Mosque and subsequent thereto has always been that Janmaasthan of Lord Ram is the place where Babri Mosque has been constructed which faith and belief is proved by documentary and oral evidence discussed above.) এবং এই কারণেই ঐ বিতর্কিত জমির পুরোটাই অর্থাৎ ২.৭৭ একর জমির পুরোটাই হিন্দুদের জন্যে নির্দিষ্ট করা হলো, এতে মুসলিমদের কোনো অধিকার থাকবে না। এই জমির অছি হিসেবে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তবে যেহেতু বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলাটা একটা জঘন্য অপরাধ হয়েছে, সেহেতু মুসলিমদের 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে শহরের কোনো এক উল্লেখযোগ্য জায়গায় (prominent place) পাঁচ একর জমি দেবে নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য। অর্থাৎ পুরো রায়টাই দেওয়া হলো প্রমাণের থেকে সরে এসে শুধু মাত্র 'বিশ্বাস'-এর ওপর দাঁড়িয়ে। 'বিশ্বাস'—যার কাছে যুক্তি দেওয়া যায় না, যার সামনে প্রমাণ দরকার লাগে না। 'বিশ্বাস' থাকলে জেরুজালেমে যীশুর জন্ম হয়, হজরত মক্কায় জন্মান, ম্যানড্রেক সত্যি হয়, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি হয়, রামের জন্ম তার জন্মের সময়ে অস্তিত্ব বিহীন অযোধ্যাতেই হয়!

যে কোনো বড়ো ঘটনার 'আফটার ম্যাথ' বা শেষের অংশ থাকে। বাবরি মামলার রায়েরও আফটার ম্যাথ আছে। সেগুলি এরকম—১। রায় ঘোষণার প্রথম যেদিন ধার্য করা হয়েছিল, সে দিনই অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবসরগ্রহণ করেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বাবরি মামলার রায়দানকারী বেঞ্চের অন্যতম সদস্য এস এ বোবদে। বাবরি মামলার শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের গড়া পূর্বতন ও পরিবর্তিত— দুটি বেঞ্চেই এনার নাম ছিল এবং মোটরবাইকের প্রতি এনার ভালোবাসা এখন ভারত বিখ্যাত। ২। ডিসেম্বরে বাবরি মামলার রায় নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের রিভিউ পিটিশনও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। ৩। ১৯ মার্চ, ২০২০ তারিখে শ্রী রঞ্জন গগৈ রাজ্য সভার সদস্য 'মনোনীত' হন, ৪। দেশব্যাপী তুমুল সমালোচনা ও টিটকারির মুখে পড়ে গগৈ জানান, শপথ গ্রহণের পরেই তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুলবেন, যা তিনি এখনও করে উঠতে পারেননি, ৫। নির্বাচনের আগে পুলওয়ামায় ঘটে যাওয়া নাশকতার কারণ এখনও খুঁজে বের করতে না পারলেও বাবরি মামলায় আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। দেশে চলতে থাকা কোভিডের প্যানডেমিক পরিস্থিতি এবং তথাকথিত 'সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং'-এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এবং ৬। মুসলিমদের জন্যে পাঁচ একর জমি ঠিক কোথায় দেওয়া যাবে, তা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি।

এদিকে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট লখনৌয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে যে মামলা দুই বছরের মধ্যে শেষ করতে বলেছিল, যে মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতীর মতো বিজেপি নেতারা, সেই মামলার রায়ও বেরিয়েছে গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে এবং কী আশ্চর্য সমাপতন, ওই দিনেই ছিল রায় দানকারী বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার যাদবের কার্যকালের শেষদিন— ঠিক রঞ্জন গগৈয়ের মতো। ১৯৯২ সালে যেদিন বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, সেদিন উনি অযোধ্যায় (তৎকালীন ফৈজাবাদ, যোগী আদিত্যনাথ গোটা ফৈজাবাদ জেলারই নাম বদলে এখন 'অযোধ্যা' করে দিয়েছেন) অ্যাডিশনাল মুন্সেফ পদে কর্মরত ছিলেন এবং উনি ঐ জেলারই মানুষ। ভদ্রলোকের ট্র্যাক রেকর্ড বলছে, ঘুরে ফিরে তিনি যেখানেই গেছেন, ফের বদলী হয়ে ফিরে এসেছেন ঐ অযোধ্যাতেই। কোনো কোনো সময়কালে তাঁর এই বদলীগুলো হয়েছিল, তার উল্লেখ আর এখানে করলাম না, তবে ওনার শেষ পোস্টিং এখানে হয়েছিল লখনৌ বেঞ্চের 'অযোধ্যা প্রকরণ' আদালতে ২০১৫ সালে এবং সেখানেই বাবরি মামলা পাঁচ বছর ধরে 'ঘুমন্ত' অবস্থায় ছিল। এই মামলাই সুপ্রিম কোর্ট ১৪২ নম্বর ধারায় তার নিজস্ব ক্ষমতা বলে ফের 'জাগিয়ে' তোলার নির্দেশ দিয়েছিল ২০১৭ সালে। সুপ্রিম কোর্ট এর সাথে একই বিষয় নিয়ে চলতে থাকা রায়বেরিলি কোর্টের একটি মামলাকেও জুড়ে দেয়। ২০১৮ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই বিচারপতিকেই আবার উচ্চ পদ দিয়ে বাবরি মামলার সে শুনানি শেষ করার দায়িত্ব দেয়, এমনকি এনার প্রতি প্রবল 'আস্থায়' এনার প্রাপ্য পদোন্নতিও তারা আটকে দেয়, যাতে প্রমোশন পেয়ে তাঁকে ওখান থেকে সরে না যেতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিশেষ আবেদন করে তিনি সে পদোন্নতি আদায় করেন এবং তাঁর একই জায়গায় থেকে যাওয়ারও ব্যবস্থা হয়। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরই তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 'শুনানি শেষ করতে না পারার কারণে' তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে 'সময়' চান, তারা সেটা মঞ্জুরও করে এবং যাদবের আরও এক বছরের 'সার্ভিস এক্সটেনশন' করা হয় 'ঐতিহাসিক ভাবে' যাতে তিনি নিজে বিচার শেষ করে নিজেই রায়দানটা করতে পারেন। যাই হোক, আড়াই হাজার পাতার রায় আদালতে ঘোষণা করতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র পাঁচ মিনিট। বলা হয়েছে যে 'উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে' সমস্ত অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস করে দেওয়া হলো। বাবরি ভাঙা যে পূর্বপরিকল্পিত ছিল, এমন প্রমাণ নাকি আদালত পায়নি, যা ঘটেছে তা নাকি 'স্বতঃস্ফূর্ত' ভাবেই ঘটেছে এবং এর পিছনে ওইসব নেতা-নেত্রীদের কোনো হাতই ছিল না। এমনকি তাঁদের সে দিনের বক্তৃতাও নাকি 'উস্কানিমূলক' তো ছিলই না, বরং তাঁদের পক্ষ থেকে নাকি বারংবার করসেবকদের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিল সংযত আচরণ করার জন্য। সংখ্যায় বেশি করসেবকরা তাঁদের সেই অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার জন্যেই এই বিপত্তি। বুঝুন একবার। দলে দলে মানুষ কোদাল, গাঁইতি, শাবল নিয়ে সভায় যোগদান করলো কোনোরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই! মানুষ তিনটে গম্বুজের ওপর উঠে সেগুলোকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল, অথচ কেউ একটুও আহত হলো না— এটাও নাকি সম্ভব কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই শুধুমাত্র 'স্বতঃস্ফূর্ততার' জোরেই। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল বিজেপির একজন নেত্রী মসজিদ ভাঙার আনন্দে দিশাহারা হয়ে আর এক জন নেতার কোলে উঠে পড়েছেন— বিশ্বাস করতে হবে সেটাও নাকি বেজায়রকম মনের দুঃখেই ঘটেছিল! অন্ততঃ আজকের আদালত সেটাই মনে করে!!

আগ্রাসনে বি জে পি-র বৃত্ত আজ সম্পূর্ণ। দুর্যোধনের দাড়ি ছিল কিনা মহাভারতের কাহিনীকার বলে যাননি, কিন্তু আজ চতুর্দিক থেকে ক্রম লম্বমান শ্মশ্রু সমন্বিত এক মুখ বিকট হাস্যে বলে চলেছে, 'নিন্দা আর নাহি ডরি, নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি। নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী, স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি মোর পাদপীঠতলে"... মধ্যম পাণ্ডব, শুনতে পাচ্ছেন? □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

দেশের কৃষকদের গভীরতম সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে দিল কৃষি বিল

বিনিয়োগ ও মুনাফার রাস্তা খুলে দিলে কৃষকের যে লাভ হবে না সেটা নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর অনুগতরা ভালোই বোঝেন। তা সত্ত্বেও শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কৃষকদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের প্রতারিত করতে তাঁরা পিছপা হন না। এত কিছুর পরেও কৃষি বিলকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়েছেন ধাপ্পাবাজ প্রধানমন্ত্রী এবং বলেছেন যে দেশের কৃষকরা নাকি এতদিনে 'স্বাধীন' হলেন। একেই বলে 'চোরের মায়ের বড়ো গলা'।

এতকাল কৃষি নীতি এবং কৃষি সংক্রান্ত আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষকদের স্বার্থ সামান্য মাত্রায় হলেও সুরক্ষিত করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। নয়া উদারনীতির চাপে এই লক্ষ্য থেকে সরকার অনেকটা সরে এলেও পুরোপুরি হাত তুলে দেয়নি। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, সরকারী উদ্যোগে ফসল ক্রয়, মান্ডিগুলির মাধ্যমে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতায় থাকা খাদ্য পণ্যগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলিকে অসহায় কৃষকরা আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করতেন। নরেন্দ্র মোদীর সরকার এবার কৃষকদের সেই শেষ সম্বলগুলিকেও নিষ্ক্রিয় ও অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে কৃষকদের সরাসরি কর্পোরেট হাঙরদের মুখে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। এবার আর মান্ডি বা কৃষি বাজার নয়—ব্যবসায়ীরাই কৃষকদের থেকে ফসল কিনবে। সরকারী কোনো নজরদারি আর থাকবে না। ব্যবসায়ীদের শর্তে ফসল বিক্রি করতে হবে কৃষকদের। নয়তো আগের থেকে চুক্তি করে রাখতে হবে। তাও ব্যবসায়ীদের শর্তে। অর্থাৎ কৃষকদের সামনে বিকল্প পছন্দ বা দর কষাকষির কোনো সুযোগ থাকবে না। কৃষকরা এমন ফসলও চাষ করতে বাধ্য হতে পারেন, যার জন্য জমির উর্বরা শক্তিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। এতদিন কৃষকরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিপণ্য উৎপাদন করতেন। একই সঙ্গে কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে ফসলের সহায়ক মূল্য পেতেন। ফলে বাজারে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রায় প্রতিটি পণ্যের জন্যই ছিল। কিন্তু এখন চুক্তি চালু হওয়ার ফলে বিনিয়োগকারীরা কৃষকদের সেইসব কৃষিপণ্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে বাধ্য করাবে যেগুলিতে তাদের মুনাফা বেশি হবে। এর ফলে বাজারে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য নষ্ট হবে। যেসব কৃষিপণ্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করানো হবে, সেগুলি মজুত করে ব্যবসায়ীরা দেশের বাজারের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করে বেশি মুনাফা অর্জন করবে। আবার যেসব কৃষিপণ্য কম পরিমাণে উৎপাদন হবে, সেগুলি দেশের বাজারের চাহিদা মেটাতে না পারায় কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি হবে এবং ব্যবসায়ীরা সেই পণ্যগুলির মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুটবে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই উৎপাদক কৃষকদের কোনো লাভ হবে না। বরং তাঁরা তাঁদের পছন্দের কৃষিপণ্য উৎপাদন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। ওদিকে আবার বাজার খুলে দেওয়ার ফলে বিদেশী কৃষিপণ্য দেশে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। সস্তার বিদেশী পণ্য কৃষকদের আরও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। তাছাড়া কৃষিপণ্যের বাণিজ্য বেসরকারী হাতে চলে যাওয়ায় এবং মজুত আইন শিথিল হওয়ার ফলে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে এবং রপ্তানি করে বিপুল অঙ্কের মুনাফা লুটবে ব্যবসায়ীরা। এর ফলে সাধারণ মানুষের জন্য বাজারে খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা যাবে না। মানুষের জীবনে নেমে আসবে গভীর অন্ধকার। তাই কৃষি বিল নিয়ে এসে সরকার কৃষকদের সাথে সাথে সাধারণ মানুষেরও সর্বনাশ করলো। তারই সাথে রাজ্যসভায় গায়ের জোরে কৃষি বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার ঘটনা ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্যে এক সর্বনাশের বার্তাও হয়ে থাকলো। □

করোনার সময়ে নারী সমাজের সঙ্কট

শাশ্বতী মজুমদার

করোনা অতিমারির মতো সারা পৃথিবীজুড়ে বিপর্যয়কর এবং আতঙ্ক সঞ্চারী ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর ঘটেনি। কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ বাদে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার ছবি যতদিন যাচ্ছে ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। আমাদের দেশে করোনা সংক্রমণের প্রথমদিকেই যে ঘটনা আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে তা বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায়নি। না, ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের থেকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকা প্রতিবেশী দেশগুলিতেও তা ঘটেনি। এক্সোডাস---বিপুল সংখ্যক মানুষের মহানিষ্ক্রমণ। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক এবং জাতি দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতি পরিস্থিতিতে মানুষ সহায়-সম্বলহীন, বাস্তুচ্যুত হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দলে দলে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে, আমাদের দেশভাগের স্মৃতিতেও তা ধরা আছে, সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে হিংসার পরিস্থিতিতেও আমরা তা দেখেছি। কিন্তু আপাত শান্তির পরিস্থিতিতে পথে পথে ঘরছাড়া মানুষের স্রোত বোধহয় আর কোথাও দেখা যায়নি। করোনা মোকাবিলায় ইচ্ছাকৃত বিলম্বিত পদক্ষেপ নিয়ে এদেশের সরকার যখন সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা আইন, ২০০৫-এর ৬(২)(ঝ) উপধারা প্রয়োগ করে জনজীবনে তালা ঝুলিয়ে দিল, তখন এদেশের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম শ্রমজীবী মানুষ'দের কাছে সেটা বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার না হলেও তার মর্মবস্তু তো প্রকৃতপক্ষে হিংসাই!

গত কয়েক দশক ধরে এই শ্রমজীবী মানুষরাই নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে, সমাজ-পরিবার সব ছেড়ে শুধু বেঁচে থাকার জন্য কাজের আশায় ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের দূর দূর প্রান্তের রাজ্যে, শহরে ও গ্রামে। আমাদের চোখের সামনেই ঘটছিল, আমাদের পাড়ায় প্রতিবেশী পরিবারে এই পরিযায়ী মানুষদের কারোর যাওয়া, কারোর আসা আমরা টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের উটপাখির চেতনায় তেমন কোনো ধাক্কা লাগেনি, যতক্ষণ না লকডাউনের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘরে ফিরতে লাগল মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে, নির্বিকার রাষ্ট্রের মৃত বিবেকের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তাদের অনেকে পথশ্রমে, খাবারের অভাবে, পুলিশের অত্যাচারে, পথ দুর্ঘটনায় মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। 'রিভার্স মাইগ্রেশন'—অপরিচিত একটি শব্দবন্ধ জায়গা করে নিল আমাদের শব্দ ভাণ্ডারে। এই ফিরতি জনস্রোতের মধ্যে নারীমুখ, শিশুমুখগুলি আরও মর্মন্তুদ দৃশ্য হাজির করতে থাকল—পথেই সন্তানের জন্ম দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করা মা, মৃত মায়ের শবের পাশে অবোধ শিশুর ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, লঙ্কা ক্ষেতে প্রতি বছর কাজ করতে যাওয়া শিশু জামলো মাকদুমের বাড়ি ফেরার আশা মৃত্যুতে শেষ হওয়া, পথিমধ্যেই প্রিয়জনকে হারিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়া। তবু উলঙ্গ রাজার দিকে আঙুল তোলা মানা। ঘৃণার জঠর থেকে উঠে আসা যে নতুন ধরনের দেশভক্তির চেতনায় ভাসানো হয়েছিল গোটা দেশকে করোনাকালের অনেক আগে থেকেই, সেখানে প্রশ্ন করা নিষেধ হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অধোগতির মানবী মুখ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তনিও গুয়েতেরেজ গত এপ্রিল মাসে বলেছিলেন, "অতিমারি লিঙ্গ অসাম্যসহ সমস্ত ধরনের অসাম্যকে নগ্ন করেছে এবং তীব্র করেছে।... অতিমারিকে সঙ্গী করে যে গভীর অর্থনৈতিক অধোগতি স্পষ্টতই তার একটি মানবী মুখ আছে।" কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রথম থেকেই সারা পৃথিবীতে লাফ দিয়ে বেড়ে ওঠা গার্হস্থ্য হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তির আবেদন করে সমস্ত দেশগুলিকে ব্যবস্থা নেবার কথা বলে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, "কোভিড-১৯ নারীদের অধিকার এবং স্বাধীনতার সামনে যে বিপদ হাজির করেছে তা শারীরিক নির্যাতনের বিপদের থেকেও অনেক সুদূরপ্রসারী।" তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, বিগত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীতে মহিলাদের যতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে কোভিড-১৯ তাকে আবার পিছন দিকে ঠেলে দেবে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভারতীয় নারীরা যে সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছেন তাতে গুয়াতেরেজের আশঙ্কাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে গত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ কমছিল উদ্বেগজনকভাবে, যদিও এই সময়েই ভারতের জি ডি পি বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি নিয়ে সরকারী পর্যায়ে এই শাসকদলগুলির অভ্যন্তরে শ্লাঘার সীমা ছিল না। ২০১১-১২ সালের ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভের ৬৮তম রাউন্ডের তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছিল দেশের সমস্ত বয়সের মোট কর্মক্ষম মহিলার মাত্র ২২.২ শতাংশ কর্মরত বা কাজ খুঁজছেন। ২০১৯ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের তথ্যে এই হার সামান্য বেশি ২৩.৪১৩ শতাংশ, যদিও এই সংখ্যা ভারতকে তার প্রায় সমস্ত প্রতিবেশী দেশের—পাকিস্তান (২৪:০৯৬ শতাংশ), বাংলাদেশ (৩৬.১৪ শতাংশ, নেপাল (৮১.৬ শতাংশ), শ্রীলঙ্কা (৩৪.৭৫ শতাংশ), ভুটান (৫৮.৩ শতাংশ), মায়ানমার (৪৭.৫৪ শতাংশ) পিছনে ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে রেগা প্রকল্পের মতো কম মজুরির হাড়ভাঙা কাজের জন্য পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি নাম লেখানোয় কাজের বাজারে তাদের অনিশ্চয়তা অনেক আগে থেকেই চিহ্নিত হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে জি ডি পির হারের নিম্নগতির সময়ে ভারতের নারীরা কাজের বাজারে আরও বিপন্নতার মধ্যে পড়েছেন।

২০২০-২১ আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি গত আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের থেকে ২৩.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই হিসাব সরকারী দলিলে প্রকাশিত। সেখানে এটাও বলা হয়েছে, কোভিড ১৯-এর কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মতো তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়েছে, সেজন্য জি এস টি প্রভৃতি বিকল্প তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, যে দেশে ৯৪ শতাংশ কর্মসংস্থান অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যার মধ্যে একটা বড় অংশ আবার কৃষিক্ষেত্রে এবং যেখানে জি ডি পি-র ৪৫ শতাংশ আসে এই অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকেই, সেখানে অসংগঠিত ক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ছাড়া করোনাজনিত লকডাউনের বিরাট ধাক্কা জি ডি পি-কে প্রকৃতপক্ষে কতটা প্রভাবিত করেছে তা সরকারী হিসেবে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়নি, প্রকৃত চিত্র আরও অনেক ভয়াবহ। (সূত্র ঃ দি ওয়্যার) এখানে উল্লেখ্য জি-২০ ভুক্ত বড় অর্থনীতির কোনো দেশেই অসংগঠিত ক্ষেত্র ভারতের মতো এত বড়ো নয়।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির একেবারে প্রথমদিকেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'র্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট অফ দি ইমপ্যাক্ট অফ কোভিড-১৯ ক্রাইসিস অন এমপ্লয়মেন্ট' রিপোর্টে সতর্ক করা হয়েছিল, সবচেয়ে বেশি কাজ হারাবেন অনিয়মিত শ্রমিক এবং স্বনিযুক্তরা। ভারতে ক্যাজুয়াল কর্মী মোট শ্রমশক্তির ২৫ শতাংশ, ২০২০ সালের জনসংখ্যা অনুযায়ী ১১ কোটি ৮০ লক্ষ, আর স্বনিযুক্তদের সংখ্যা ১২ কোটি ৩০ লক্ষের কিছু বেশি। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা যেহেতু এই ধরনের অনিয়মিত কাজে অংশগ্রহণ বেশি করেন, তাই তারা কাজ হারিয়েছেনও বেশি। (সূত্র ঃ দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস) এবছর এপ্রিল মাসে আজিম প্রেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শহরাঞ্চলে অনিয়মিত ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ৮২ শতাংশ মহিলা এবং ৮০ শতাংশ পুরুষ কাজ হারিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে কাজ হারিয়েছেন ৭১ শতাংশ মহিলা এবং ৫৭ শতাংশ পুরুষ। শহরাঞ্চলে স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে ৮৯ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ কাজ হারিয়েছেন।

সেন্টার পর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমির সমীক্ষায় প্রকাশ, লকডাউনের প্রথম মাসে ১২ কোটি ১৫ লক্ষ কাজ হারিয়েছিলেন। ঐ রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, এপ্রিল ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২০-তে গড় কর্মরত মহিলার সংখ্যা কমেছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ। অর্থনীতিবিদ অশ্বিনী দেশপান্ডে সি এম আই ই-র তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ২০১৯-২০ সালের মার্চ মাসে কর্মরত মহিলার সংখ্যা যদি ১০০ ধরা হয় তাহলে ২০২০ সালের এপ্রিলে তা হয়েছিল ৬১। পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অনুপাত ছিল ৭১ শতাংশ। এখানেই বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট। এদের মধ্যেও আবার অসমতা আছে। গ্রামীণ মহিলারা কাজ হারিয়েছেন বেশি। করোনা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় তাদের ৫৭ শতাংশ মাত্র কাজে টিঁকেছিলেন এপ্রিল ২০২০-তে। ঐ সময়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ছিল ৭৩ শতাংশ। শহরের শ্রমজীবী পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে ৬৭ শতাংশ ও ৬৯ শতাংশ।

কাজ হারানো এই বিপুল অংশের মহিলাদের মধ্যে আবার তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের অবস্থা আরও বেশি ভয়াবহ। এদের বেশিরভাগই অনিয়মিত ধরনের কাজে যুক্ত। শহরাঞ্চলে তপশিলী জাতিভুক্তদের মধ্যে কর্মহীনতা সবচেয়ে বেশি। সমস্ত ধরনের সামাজিক গ্রুপগুলোর মধ্যে শিক্ষিত তপশিলী জাতিভুক্তরা বেকারত্বের শিকার সবচেয়ে বেশি। সামাজিক বাধাই এর কারণ। যদিও সংরক্ষণ সম্পর্কে জনমানসে বিশেষ করে উচ্চবর্ণের মানুষদের বিরূপতা এই বাস্তবতার উল্টো ধারণার প্রসার ঘটায়।

সি এম আই ই-র গত আগস্ট মাসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এপ্রিল মাসে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যত মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন জুন মাসের পর থেকে তাদের একটা বড় অংশই কাজে ফিরেছেন যদিও এখনও ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ কাজে ফিরতে পারেননি। এই সংখ্যাটাও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু যারা কাজে ফিরেছেন বলা হচ্ছে তারা কিসের বিনিময়ে ফিরেছেন? বুঝতে অসুবিধা হয়না এই সঙ্কটকালেই যেকোনো মূল্যে, যেকোনো শর্তে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলিতে তারা নতুন করে নিযুক্ত হচ্ছেন কোনোক্রমে বেঁচে থাকার তাগিদে। কারণ সরকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টির যেমন কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই, তেমনই এই সময়েই সুযোগ বুঝে শ্রমিক শোষণের পথে সব বাধা তুলে দেবার জন্য 'শিল্প শ্রম কোড আইন, ২০২০' রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনের শেষদিন বিরোধীশূন্য অবস্থায় পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ৩০০ শ্রমিক আছে এমন সংস্থাতেও ছাঁটাইয়ের জন্য আর আর রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাগবে না। দেশের ৭০ শতাংশ সংস্থাই এর মধ্যে পড়বে। সেখানে নিযুক্ত দেশের ৭৪ শতাংশ শ্রমশক্তির ওপর যথেচ্ছ আক্রমণে কোনো বাধাই রইলো না। এর আগেই শ্রম অধিকার যথেচ্ছ লঙ্ঘিত হচ্ছিল। এবার সরকারী সিলমোহর পড়ল। উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার গত মে মাসেই অর্ডিন্যান্স জারি করে শ্রমিক স্বার্থবাহী প্রধান প্রধান শ্রমআইনগুলি ৩ বছরের জন্য রদ করেছিল। মে মাসেই ওড়িশা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সরকারগুলি ফ্যাক্টরি আইনকে দূরে সরিয়ে রেখে সপ্তাহে ৬ দিন ১২ ঘণ্টার শিফট অর্থাৎ শ্রমিকদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার জায়গায় ৭২ ঘণ্টা খাটানোর ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিল। এসবই হয়েছিল লকডাউনের পর অর্থনীতিকে আবার পুনরুদ্ধারের বাহানায়।

বেতনভুক কর্মীদের কাজ হারানো আরেকটা উদ্বেগ তৈরি করেছে। গত এপ্রিল মাসে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ বেতনভুক কর্মী কাজ হারিয়েছিলেন, মে মাসে কাজ হারান আরও ১ লক্ষ, তাদের মধ্যে ৩৯ লক্ষ জুনের আনলক পর্বে আবার কাজ ফেরত পাবার পর, জুলাই মাসে নতুন করে ৫০ লক্ষ বেতনভুক কর্মী কাজ হারিয়ে কর্মচ্যুতদের সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, বেতন সম্পর্কিত চুক্তি আছে এমন কাজ একবার হারালে সহজে আর পাওয়া যায় না। তাহলে এই অংশের কর্মীরা কোথায় যাবেন? তাঁরা নিশ্চিতভাবেই অসংগঠিত শ্রমিকদের দলেই এসে যুক্ত হবেন।

এই পরিস্থিতি মহিলাদের আরও বেশি কর্মক্ষেত্রের বাইয়ে ঠেলে দেবে। এমনিতেই আমাদের দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পরিকাঠামো মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুকূল নয়; যাতায়াত ব্যবস্থা, ক্রেশের ব্যবস্থা, শৌচাগারের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় এতই অপ্রতুল যে তা মহিলাদের কর্মসংস্থানের পথে একটা বড় বাধা। শিক্ষিত নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি করোনা পরিস্থিতির অনেক আগে থেকেই একটি মারাত্মক প্রবণতা হিসাবে দেখা যাচ্ছিল। এন এস এস ও-র সমীক্ষা অনুযায়ী শহরাঞ্চলে শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে বেকারত্ব ২০১১-১২ সালে ছিল ১০.৩ শতাংশ, ২০১৭-১৮ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ১৯.৮ শতাংশ, যা শহরাঞ্চলের শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের দ্বিগুণ। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে ২০১১-১২ সালে বেকারত্ব ছিল ৯.৭ শতাংশ, ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৭.৩ শতাংশ।

এই পরিস্থিতিতে করোনার আগমনে যে সামাজিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে তা বিশেষত মধ্যবিত্ত নারীদের ক্ষেত্রে ঘরের বাইরের কাজে যুক্ত হবার পথে প্রতিকূলতা তৈরি করবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শত শত বেড়া ভেঙে যে মেয়েরা শিক্ষার আলো পাবার জন্য, বাইরের উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আকুল, তাদের জীবনের লড়াই অনেক কঠিন করে দেবে সামগ্রিক কর্মসঙ্কোচনের পরিস্থিতি। তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার বেসরকারীকরণ, অনলাইন শিক্ষা ও পরীক্ষা দরিদ্র মেয়েদের জীবন থেকে শিক্ষার আলো পাবার আশাও মুছে দেবে এবং পরোক্ষে তাদের ঠেলে দেবে কর্মহীনতা, অধিকারহীনতা এবং ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনতাহীনতার অন্ধকারে।

করোনা যোদ্ধারা

করোনা যোদ্ধাদের নিয়ে প্রচুর গালভরা কথা বলা হচ্ছে। কাঁসরঘণ্টা, দিয়া জ্বালানো অনেক কিছু হলেও করোনা মোকাবিলায় যারা জীবন বাজি রেখে লড়ছেন সেই ডাক্তার, নার্স, সাফাইকর্মী, শুশ্রুষাকর্মীদের সুরক্ষা দিতে সরকার কতটা আন্তরিক? আমাদের দেশে করোনা যোদ্ধা ডাক্তারদের এক তৃতীয়াংশ, এবং নার্সিং কর্মচারীদের ৮০ শতাংশ, সাফাইকর্মী, ল্যাবরেটরি কর্মী, টেকনিশিয়ান সহ হসপিটাল কর্মীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ মহিলা। যারা ঠিকমতো পি পি ই পর্যন্ত পাননি বহুক্ষেত্রে। জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত সারা দেশের প্রায় ৯ লক্ষের কাছাকাছি প্রশিক্ষিত সামাজিক চিকিৎসা কর্মী এবং আশা কর্মীরা করোনা রোগী চিহ্নিতকরণ এবং পরবর্তী নজরদারির কাজে যুক্ত। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও একই কাজে যুক্ত। অথচ সরকার তাদের এই কাজের জন্য মাসে ১০০০ টাকা করে দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা তারা পায়নি। কোথাও কোথাও অসহনীয় পরিবেশে কাজ করতে করতে ডাক্তার-নার্সদের বিক্ষোভ দেখাতে, ধর্মঘট করতে পর্যন্ত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য বেতনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ পর্যন্ত হতে হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই করোনার আতঙ্কে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাদের লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের দুর্দশা

গত ৩০ মে হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকা রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্সের তথ্য উদ্ধৃত করে জানায়, ৯ থেকে ২৭ মে-র মধ্যবর্তী সময়ে 'শ্রমিক স্পেশাল' ট্রেনে চড়ে যাবার সময়ে মোট ৮০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সংসদে শ্রমমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয় লকডাউন পরবর্তীকালে পরিযায়ী শ্রমিকদের কত জন বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা। এর উত্তরে তিনি বলেন, সরকারের কাছে এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই, এবং সেজন্য ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন ওঠে না। বরং তিনি পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য সরকার ফুড প্যাকেট, রেশন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা কী দিয়েছেন তা বলতে থাকেন। অপরিকল্পিত লকডাউনে সবচেয়ে দুর্দশায় যারা পড়ল তাদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্লজ্জ উদাসীনতার এটি আর একটি নমুনা।

শ্রমমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, ১ কোটি ৪ লক্ষ আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক তাদের নিজ রাজ্যে ফিরেছেন। সবচেয়ে বেশি ফিরেছেন উত্তরপ্রদেশ (৩২.৪ লক্ষ), বিহারে (১৫ লক্ষ), রাজস্থানে (১৩ লক্ষ)। ৪৬১১টি শ্রমিক স্পেশালে ৬৩.০৭ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে এক জায়গা থেকে আরএক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

লোকসভায় ২০১১ সালের ৭ মার্চ একটি আনস্টার্ড প্রশ্ন নং ১৭৬৮-র উত্তরে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন, দেশের অভ্যন্তরে পরিযায়ী শ্রমিকরা 'ইন্টার স্টেট মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কমেন (রেগুলেশন অফ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড কন্ডিশন অফ সার্ভিসেস) অ্যাক্ট, ১৯৭৯ অনুযায়ী কিছু সুবিধা পেতে পারেন। যেমন— ১। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি, ২। যাতায়াতের গাড়িভাড়া, ৩। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে কাজের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট ভাতা, ৪। থাকার জন্য ঘর, ৫। ডাক্তার ও চিকিৎসার সুযোগসুবিধা, ৬। আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই পোশাক। এছাড়াও দেশের ৬টি শ্রম আইন এদের জন্য প্রযোজ্য। ১। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩, ২। বেতন প্রদান আইন, ১৯৩৬, ৩। শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭, ৪। ই এস আই আইন, ১৯৪৮, ৫। প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, ১৯৫২, ৬। মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ১৯৬১। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারগুলির দায়িত্ব ছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা সুবিধা পাচ্ছে কিনা দেখা। অথচ কোনো সুবিধাই যে এরা পায় না এবং প্রায় দাস শ্রমিকদের মতো জীবনযাপনে তাদের বাধ্য করা হয়, এটাই লকডাউন পর্বের ঘটনাবলী প্রকাশ করে দিল।

পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ১০ থেকে ১৪ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছেন, যাদের মধ্যে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি, এরা দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ। কিন্তু কয়েকজন গবেষক দেখিয়েছেন, মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশই বাদ পড়ে যান বিভিন্ন সমীক্ষায়। এর কারণ তাদের পরিবারের দ্বিতীয় উপার্জনকারী হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু হামেশাই তারা বৈবাহিক কারণে পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে অন্যত্র গিয়ে গৃহ সহায়িকা, ফুল / ফল / সব্জি বিক্রি প্রভৃতি নানা ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং পরিবারের পুরুষটির যখন কাজ থাকে না, বা অপেক্ষাকৃত পছন্দসই মজুরির কাজ খোঁজার জন্য যখন অপেক্ষা করেন তখন নানারকম কম মজুরির কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণ চালান এই মহিলারাই। অনেক সময় এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে কাজ করতে যাওয়া মরশুমী পরিযায়ীরাও হিসাব থেকে বাদ পড়ে যান।

বিভিন্ন রাজ্যে নির্মাণ শিল্প, ইঁটভাটা প্রভৃতি জায়গায় বহু নারী পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন। মাতৃত্বকালীন সুবিধা ছাড়াই তারা কাজ করতে বাধ্য হন। অত্যন্ত খারাপ কাজের পরিবেশ, এত কম মজুরি যাতে জীবনধারণও করা যায় না, থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ মজুরির টাকা কেটে নেওয়া, হাড় ভাঙা খাটুনি, বৈষম্য, যৌন হেনস্থা, শারীরিক নির্যাতন—এসবের মধ্যে তাদের শ্রম চুরি করে মুনাফার পাহাড় তৈরি হয়। লকডাউনের পর্বে বহু পরিযায়ী শ্রমিকের অভিজ্ঞতা হলো, মালিক বা কনট্রাক্টর শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি পর্যন্ত দেয়নি।

কোভিড সংক্রমণের সময়ে গৃহসেবিকারা অন্যের গৃহের অভ্যন্তরে শারীরিক সংস্পর্শের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। অসংখ্য গৃহসেবিকা কাজ হারিয়েছেন, তাদের মধ্যে একাংশ কাজের সঙ্গে আশ্রয়ও হারিয়েছেন। তাই বুঝতে অসুবিধে হয় না লকডাউনে ঘরে ফিরতে চাওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন জেনেও কেন তারা দলে দলে সেই পথই বেছে নিয়েছিলেন।

কৃষি অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের বড় অংশই বিভিন্ন বিধিবর্হির্ভূত (ইনফর্মাল)

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ভারতের বৃদ্ধির সংকটের বিশ্লেষণ

সি পি চন্দ্রশেখর

অতিমারি অর্থনীতির ক্ষতি করেছে, কিন্তু প্রাক-অতিমারি মন্দা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা এবং অর্থনীতিতে কোভিডজনিত ঝটকা সামলাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল পদক্ষেপের ফলেই, দেশে বর্তমান ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছেছে।

যদিও এটা বোঝাই যাচ্ছিল যে, ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতীয় অর্থনীতি সঙ্কোচনের কবলে পড়বে, কিন্তু জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৩.৯ শতাংশ সঙ্কোচন অনেককেই বিস্মিত করেছে। কারও কারও ক্ষেত্রে সংকোচনের পরিমাণ বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, কারণ ২০ শতাংশের কম সংকোচনের পূর্বাভাষ ছিল। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কারণ হলো, সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশের প্রশ্নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই, যে তথ্য অবশেষে পাওয়া গেছে, তা প্রকৃত অবস্থা যা ছিল তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এবং সরকার যা পছন্দ করত বলে মনে হয়, তার থেকেও সম্ভবত সত্যের বেশি কাছাকাছি।

২৪ শতাংশ জিডিপি সংকোচন শুধুমাত্র এর পরিমাণগত কারণেই উল্লেখযোগ্য নয়। আরও বেশি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, অতিমারির ভয়াবহ সংক্রমণ ঘটেছে এমন দেশগুলির অর্থনীতির সংকোচনের তুলনায়, ভারতে সংকোচনের হার বেশি। চীনের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.২ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্য, যাদের ভূমিকা ছিল খারাপ, সেখানে সংকোচন ঘটেছে ২০.৪ শতাংশ হারে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতির সংকোচনের মাত্রায় বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মার্চ, ২০২০-এর শেষ দিকে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক কঠিন দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হয়। শুরুতে ২১ দিনের লকডাউনের কথা বলা হলেও, ২০২০-র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পুরো সময়টা ধরে যথেষ্ট কঠিন লকডাউন প্রক্রিয়া জারি রাখা হয়। যেহেতু লকডাউন মানে, বিক্ষিপ্তভাবে বেছে নেওয়া কিছু জরুরি পরিষেবা ছাড়া, বাকি সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা, তাই উৎপাদনের সংকোচন ছিল অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, যে নির্মাণ শিল্প, বাণিজ্য, হোটেল ও পরিবহনের মতো সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রগুলিসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিপুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়েছে।

সরকারী প্রচার ভাষ্যে, অতিমারিজনিত লকডাউনের কারণে অর্থনীতির যে সংকোচন, তাকে ব্যবহার করে দু'ধরনের যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। প্রথমত, যেহেতু লকডাউন তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ২০২০-র তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষদিকে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বর্তমান অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে (২০২০-২১) অর্থনীতির 'V' আকৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে। দ্বিতীয়ত, অতিমারি ও লকডাউনের ধাক্কায় অর্থনীতির সংকোচন ঘটেছে। এর সাথে সরকারী নীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

V-আকৃতির পুনরুজ্জীবন :

V-আকৃতির পুনরুজ্জীবনের যে আশাবাদী অনুমান, তা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ঘটনাবলীর মূলগত সংযোগগুলিকে লক্ষ্যই করেনি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিসংখ্যান থেকে এটা বোঝা যায়, বেসরকারী খরচ ও বিনিয়োগ উভয়ই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায়, বর্তমান বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বেসরকারী খরচ হ্রাস পেয়েছে ২৭ শতাংশ এবং বেসরকারী বিনিয়োগ ৪৭ শতাংশ। এই হ্রাস প্রাপ্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা অন্যান্য তথ্য থেকে জানা যায়, তা হলো কর্মসংস্থান ও আয়ের উদ্বেগজনক পতন। যার ফলে বিবেচনা প্রসূত খরচ হ্রাস পেয়ে অথবা ক্রয় করার সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখার ফলে চাহিদা আরও সঙ্কুচিত হবে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের স্বাভাবিক মাত্রায় এখনই ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে না। এমনকি কোভিড-১৯-এর ধাক্কা কেটে গেলেও অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো স্বয়ংক্রিয় বা বলিষ্ঠ কোনোটিই হবে না।

অতিমারির স্থায়িত্ব :

বাস্তব হলো এই ধাক্কা দ্রুত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের অভ্যন্তরে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, অতিমারি আরও কিছুদিন স্থায়ী হবে শুধু তাই নয়, পশ্চাদপসরণের আগে আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। এর ফলে জাতীয় স্তরে না হলেও, আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্তরে লকডাউনে ফিরে যেতে হতে পারে। সুতরাং ২০২০-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে শুধুমাত্র কোভিড-১৯ উত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, এই অনুমান ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

একমাত্র যে পথে অতিমারির ধ্বংসাত্মক ফলের মোকাবিলা করা যেত, তা হলো আর্থিক প্রণোদনার (fiscal stimulus) মাধ্যমে সরকারের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ। কিন্তু বহু পর্যবেক্ষকেরই অভিমত হলো, মার্চ মাসে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা করা আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত গুচ্ছ প্রস্তাবের অধিকাংশ পূর্ববর্তী ব্যয় সংক্রান্ত ঘোষণাকে নতুন মোড়কে এবং, অথবা এগিয়ে আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ব্যয় সংক্রান্ত নতুন প্রস্তাব, খুব বেশি হলে, জিডিপি-র কমবেশি এক শতাংশ। কোভিডের ছোবলের তীব্রতার নিরিখে এই ঘোষণা প্রকৃত প্রয়োজনের ভগ্নাংশ মাত্র। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ, যা বেসরকারী খরচ ও বিনিয়োগ যে হারে হ্রাস পেয়েছে, তাকে সামলানোর জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। লক্ষ্যণীয় হলো, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি-র ব্যাপক সংকোচনের তথ্য প্রমাণ জনসমক্ষে আসার পরেও, আর্থিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নে সরকার নির্বিকার। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী সংকট এড়ানো যাবে না বলেই মনে হয়।

এই মূল্যায়ন অবশ্যই অতিমারি যে সংকটের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, শুধুমাত্র তার ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। কিন্তু অতিমারির প্রাদুর্ভাবের আগেই, ভারতীয় অর্থনীতি, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাপের ভিত্তিতে, এমনকি স্ফীত বৃদ্ধির হারের প্রতি পক্ষপাতমূলক ঝোঁক সত্ত্বেও, লক্ষ্যণীয়ভাবে তার গতি হারাচ্ছিল। ২০১৮-র প্রথম ত্রৈমাসিকের ৮.১ শতাংশ উচ্চ হার থেকে কমতে কমতে জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২০-এর প্রথম ত্রিমাসিকে ৩.১ শতাংশে পৌঁছোয়। এই নিম্নগামীতার কারণ, গাড়ি শিল্প থেকে শুরু করে বিস্কুট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যত চাহিদার মন্দা। এই নিম্নগামীতাকে ঠেকানোর জন্যও আর্থিক প্রণোদনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অথচ তা না করে, সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ, অর্থমন্ত্রী কর্পোরেট সেক্টরকে প্রত্যক্ষ করে বিপুল ছাড়ের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে নীট লাভকে সাময়িকভাবে মদত দেওয়া হলো, কিন্তু বেসরকারী বিনিয়োগ পুনরুজ্জীবনে এই সিদ্ধান্ত কোনো কাজে লাগল না, কারণ চাহিদার মন্দা কাটানোর জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। উপরন্তু বৃদ্ধির হারের পতনের ফলে, রাজস্ব সংগ্রহের ঘাটতি যে আর্থিক সংকট তৈরি করেছিল, কর ছাড়ের সিদ্ধান্ত তাকে তীব্রতর করে তুললো। অতিমারির শুরুর সময় যেমন, ঠিক তেমনই তখনও অর্থমন্ত্রী ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পরিণতিতে দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র মন্দা অবশ্যম্ভাবী।

এরই আলোকে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের সংকোচনে নীতির কোনো ভূমিকা নেই, এই যুক্তিটিকে বিচার করতে হবে। নীতির অবশ্যই একটা ভূমিকা ছিল, তবে তা শুধু এই কারণে নয় যে, দেশব্যাপী কড়া লকডাউনের আকস্মিক সিদ্ধান্ত ছিল সাংঘাতিক ভুল এবং দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করা ব্যতীত এর থেকে ইতিবাচক ফল কার্যত কিছুই পাওয়া যায়নি। অতিমারির মোকাবিলায় গৃহীত আর্থিক পদক্ষেপগুলিও পতন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। নীতির একটা ভূমিকা অবশ্যই ছিল, কারণ অতিমারির পূর্বেই ভারতীয় রাষ্ট্রের আর্থিক সংকট দূরীকরণে সরকারের যে ভূমিকা পালন করার কথা ছিল, তা না করে, বেসরকারী ক্ষেত্র যাতে সেই ভূমিকা পালন করে, তার জন্য তোষামোদ করা শুরু হলো। এই পরিস্থিতিতে যখন অতিমারির প্রাদুর্ভাব ঘটল, তখন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স, যাদের আর্থিক ঘাটতিকে নীচের দিকে বেঁধে রাখা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে, তারা সংকট নিরসনে সরকারী খরচ বৃদ্ধির খুব বেশি রাস্তা খুঁজে পেল না।

এরই মধ্যে, আরও একটি বিষয়ের বাস্তবে কিছু জটিলতা রয়েছে। জুলাই মাসে প্রকাশিত ভোগ্যপণ্যের মূল্যসচক মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিলে গেল। জুলাই ২০১৯-এর তুলনায় এই হার ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেল। যদিও এই হার খুব বেশি উদ্বেগজনক নয়, কিন্তু রক্ষণশীল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেঁধে দেওয়া ৬ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির হারের থেকে বেশি। এর প্রধান কারণ ছিল, পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও বর্ধিত উৎপাদন সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের মূল্য সচক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া। মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যশস্যের মূল্যসচক উভয় ক্ষেত্রেই জুন মাসের পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৬.২ শতাংশ এবং ৮.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি ঘটল। অতিমারিজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই যোগান প্রক্রিয়ায় যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল এবং হচ্ছে, তা ভালো বৃষ্টির কারণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুফলকে অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্র মিলিয়ে সর্বমোট মূল্য সংযুক্তি, ২০২০-র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ২২.৮ শতাংশ হ্রাস পেলেও, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৪ শতাংশ হারে। এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও, খাদ্যশস্যের দাম ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

এই ঘটনা আর বি আই-কেও কিছুটা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, যখন আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত তাদের মনিটরি পলিসি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে সৃষ্ট সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা এবং অর্থনৈতিক দূরবস্থা লাঘব করার জন্য আর সুদের হার কমানো হবে না। যদিও কিছুদিন আগেও এই সরকার কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করেই আর্থিক প্রণোদনা আটকে রেখে বৃদ্ধির জন্য আরবিআই-এর পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে খেলাটা ঘুরে গেছে এবং আরবিআই এখন অর্থমন্ত্রকের কোর্টে বলটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। ফিনান্সিয়াল পত্রিকায় সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরবিআই গভর্নর একদিকে যেমন আগামী দিনগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পাওয়ার অনুমান ব্যক্ত করেছেন, তেমনই আরও বলেছেন, "সরকার আরও বেশি বৃদ্ধি সহায়ক পদক্ষেপ ঘোষণা করবে।" অবশ্য এটা স্পষ্ট নয়, অর্থমন্ত্রকের সাথে কোনো আলোচনার ভিত্তিতে তিনি একথা বলেছেন কিনা? যদিও উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে অতি সাবধানী একটা মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছেন, "কিন্তু তারা আর্থিক সম্প্রসারণের যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, তা হবে ধাপে ধাপে এবং বিচক্ষণতা প্রসূত।"

এক কথায় বলা যায়, কোভিড-১৯ অতিমারি অন্যান্য দেশের মতোই ভারতের অর্থনীতিরও ক্ষতি করেছে। কিন্তু ঋণ বুদবুদের মাথায় চড়া বৃদ্ধির উপাখ্যানের সমাপ্তি, এর পরিণতিতে যে আর্থিক মন্দা তার সমাধানে ব্যর্থতা এবং অর্থনীতির ওপর কোভিড-১৯-এর ধাক্কা প্রতিরোধে দুর্বল পদক্ষেপ প্রভৃতি একযোগে পরিস্থিতিতে আরও খারাপ করেছে। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জি ডি পি পরিসংখ্যানে যে সংকটের চিত্র ধরা পড়ছে, সেটাই সব নয়। এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং V-আকৃতি পুনরুত্থানের প্রত্যাশা, একটি অভিলাষী ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। দেশকে এই দূরবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতি অবশ্যই একটা ভূমিকা পালন করেছে। ◻

অনুবাদ : সুমিত ভট্টাচার্য

[সৌজন্যে : ফ্রন্টলাইন, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২০]

সপ্তম পৃষ্ঠার পরে

করোনার সময়ে নারী সমাজের সঙ্কট

অ-কৃষিকাজে আকৃষ্ট হয়েছেন। বিগত দেড় দশক ধরে দেশজুড়ে কৃষক আত্মহত্যা প্রমাণ করেছে কিভাবে দেশের শাসকরা কর্পোরেট স্বার্থে 'সিস্টেম্যাটিকালি' কৃষি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কৃষিমজুর হিসাবে হোক বা অ-কৃষিকাজের শ্রমিক হিসাবে একই জেলার মধ্যে, একই রাজ্যের অন্য জেলায়, বা অন্য রাজ্যে তাই পরিযান ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যদিও করোনার প্রাদুর্ভাবের আগে ভারতীয় অর্থনীতির শ্লথগতির জন্য কয়েক বছর বহু মানুষ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ হারানোয় রিভার্স মাইগ্রেশন ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। এই ঘরে ফেরা মানুষদের জন্য সরকারের করণীয় কিছু নেই? যখন এদের সুরক্ষা দেওয়াটাই দেশের নির্বাচিত সরকারের প্রধানতম কাজ হওয়া উচিত, তখনই সরকার জঘন্যতম কৃষি চুক্তি আইন করে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতলো। কৃষিচুক্তির বিভিন্ন দিক এতই আক্রমণাত্মক যে সরকারের প্রধান শাসকদলের জোটসঙ্গীরা পর্যন্ত সমর্থন করতে পারছেন না।

ভগবানের হাত

গত ২৭ আগস্ট দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক শেষে কম রাজস্ব সংগৃহীত হওয়ার কারণ হিসাবে 'ভগবানের হাত'-এর দোহাই দিয়েছেন। কোনো সভ্য দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনগণকে সুরাহা দিতে ব্যর্থ হয়ে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে এহেন ছেলে ভুলানো কথা বলে পার পেয়ে যান জানা নেই! অথচ যে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক নীতির আক্রমণে দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের চরমসীমায় পৌঁছে আজ কোভিড পরিস্থিতির ধাক্কায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল, সেই নীতির সহায়তাতেই ধনীদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেই। এই সময়েই মুকেশ আম্বানি এক মাসের মধ্যে ১০০০ কোটি ডলার বাড়তি মুনাফা করে বিশ্বের চতুর্থ এবং এশিয়ার এক নম্বর ধনী ব্যক্তি হয়েছেন। এই মুহূর্তে ঘণ্টায় তার উপার্জন ৯০ কোটি টাকা। অথচ প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর উচিত ছিল বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী আয়করবৃত্তের বাইরে থাকা মানুষদের ৬ মাস পরিবারপিছু ৭৫০০ টাকা ক্যাশট্রান্সফার ও সকলের জন্য রেশন চালু করে এই সময়ে ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে কিছুটা বাঁচানোর চেষ্টা করা। সংসদে দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী নিজেকে 'পড়োশী আন্টি' বললেও জনগণের থেকে পুঁজিপতিদেরই জন্য তিনি বা তাঁর দল নিবেদিতপ্রাণ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ভূমিকা দেখে একটা পুরোনো কথাই মনে পড়ছে। কোনো নারী নীতি নির্ধারকের পদে আসীন হলেই নারীসংবেদী নীতি তিনি গ্রহণ করবেন এমনটা নয়। তিনি কোন মতাদর্শে পরিচালিত হচ্ছেন তাই-ই ঠিক। করে তাঁর নীতির অভিমুখ।

একই কথা বলতে হয় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধেও। স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ তাঁর সরকার কোভিড টেস্ট নিয়ে প্রথমদিকে তথ্যের কারচুপি না করলে এ রাজ্যে কোভিড অনেকটাই ঠেকানো যেতে পারত। তিনিও তাঁর দলের সদস্যদের বাধা দেননি, যখন তারা অসহায় বুভুক্ষু মানুষের রেশনের চাল বা আমফান দুর্গতদের খাবার, ত্রিপুল চুরি করেছে।

এর উল্টো উদাহরণও এই দেশেই আমরা দেখলাম করোনার সময়ে। কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতি কে শৈলজা নিজে নেতৃত্ব দিয়ে তাঁদের রাজ্যে যেভাবে অতিমারীর মোকাবিলা করে মানুষকে রক্ষা করলেন জননীর মতো, বিকল্প নীতির প্রয়োগে তা বিশ্বের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে রইলো। রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্যন্ত তাঁর কৃতিত্বে সম্মান জানানোয় গর্বিত হয়েছে গোটা দেশ।

উত্তরণের পথ কী

এই দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটিও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার পাওয়া যাবে না, যারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নন। বিপর্যয়ে কাজ হারানো বা উপার্জন কমে যাওয়া মানুষরা কেউ না কেউ আমাদের পরিবারে, আমাদের আত্মীয়বন্ধু পরিজনদের মধ্যে বা পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে রয়েছেন। মোট কথা পরিস্থিতিটা আর মুখ ফিরিয়ে থাকার মতো নয়। কারণ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে চাকরিও আর ততটা নিরাপদ বলে মনে করছেন না কেউই।

অথচ কিছুদিন আগেও দেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তার দাবিতে, সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে দেশব্যাপী ধর্মঘট হলেও আমাদের অনেকের মন টলেনি শুধুমাত্র নিজের নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ভাবনায়। আজ কিন্তু বোঝবার, অন্যকে বোঝাবার সময় এসেছে—পড়শীর ঘরে আগুন লাগলে নিজের মাথার চালটাও রক্ষা পাবে না।

এই করোনার অতিমারির সময়ে কর্মরত মহিলাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোমের সঙ্গে বাড়তি দায়িত্ব হয়েছে সন্তানের অনলাইন পড়াশোনায় সাহায্য করা, গার্হস্থ্য দায়িত্বে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছেন মেয়েরা। পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদে সামিল হবার সময় কোথায়! অথচ আগামীদিনে হয়তো জীবনজীবিকার এই নিশ্চয়তা নাও থাকতে পারে, আগামীদিনের কর্মপ্রার্থী সন্তানের সামনে কাজের দরজা খোলা নাও থাকতে পারে। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে নারী বা পুরুষ বলে আদালা করে কাউকেই রেয়াত করবে না। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় আঘাত করার জন্য নিজেদে মনকে প্রস্তুত করতে হবে। সামনের দিন জোর লড়াই। সকল অংশের মহিলাদেরও সেই লড়াইয়ে সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই লড়তে হবে, কারণ এই ব্যবস্থায় শ্রমজীবী হিসাবেও তাদের শোষণের বোঝাটা বাকিদের থেকে ভারি। ◻

সরকারী কর্মচারী সংহারে কেন্দ্র সরকারের নয়া ফতোয়া

প্রণব কর

কেন্দ্রে মোদী সরকার আসীন হবার পর থেকেই একের পর এক শ্রমজীবি, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী আইন, আদেশনামা সমানে নামিয়ে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। অতি সম্প্রতি তিনটি কৃষি বিল এবং তিনটি শ্রম কোডের বিল যেভাবে সংসদে পাশ করানো হলো তা আসলে গণতন্ত্রকে হত্যা করা ছাড়া আর কিছু নয়। সারা দেশ এই সমস্ত বিলের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে পথে নেমে এসেছে।

এ সবের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভেন্সেস এন্ড পেনশন মন্ত্রকের অধীনস্থ পার্সোনেল এন্ড ট্রেনিং দপ্তরের ২৮/০৮/২০২০ তারিখের 25013 নং আদেশনামাটি কিছুটা গোপনে যেভাবে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হলো তা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমজীবি-কৃষক-কর্মচারী বিরোধী চরিত্রটাই আরও উন্মোচিত করেদিল।

এই আদেশনামাটির মূল লক্ষ্য হলো জনস্বার্থে (?) সরকারী কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদপূর্ণ হবার আগেই অবসরে পাঠানো। এ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিমধ্যেই যে সমস্ত নিয়মাবলী ছিল সেগুলিকে একত্রিত করে এই আদেশনামাটি তৈরি করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই সরকারী কর্মচারীদের অবসরগ্রহণ করানো সংক্রান্ত তিনটি কেন্দ্রীয় আদেশনামা প্রচলিত রয়েছে—ফন্ডামেন্টাল রুল 56(j), ফন্ডামেন্টাল রুল 56 (1) এবং রুল 48(1)(b) অব সি.সি.এস (পেনশন) রুলস, ১৯৭২। প্রাথমিকভাবে এই বিধিগুলিতে কী বলা আছে তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন—

(ক) **এফ.আর. 56(j) ঃ** জনস্বার্থে যদি এটা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়, তবে একজন সরকারী কর্মচারীকে, কমপক্ষে তিনমাস আগে লিখিত নোটিশ দিয়ে বা লিখিত নোটিশের পরিবর্তে তিন মাসের বেতন ও ভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণ করানোর পরিপূর্ণ অধিকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আছে,—

(i) যদি সেই সরকারী কর্মচারী **কোনো গ্রুপ 'এ' বা গ্রুপ 'বি' সার্ভিস (কৃত্যক) বা পদে** স্থায়ী (সাবষ্টানটিভ), আধা-স্থায়ী (কোয়াসি-পার্মানেন্ট) বা সাময়িক (টেম্পরারি) ভাবে কর্মরত থাকেন এবং সরকারী চাকুরীতে ৩৫ বছর বয়সের আগে যোগদান করেন, তবে তার ক্ষেত্রে **তার বয়স ৫০ বছর হলেই;**

(ii) অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে **বয়স ৫৫ বছর হলেই।**

(খ) **এফ. আর. 56(j) ঃ** (i) পরিচ্ছেদে যাই বলা থাকুক না কেন, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলে, **গ্রুপ 'সি' সার্ভিস (কৃত্যক) বা পদে অধিষ্ঠিত** এবং কোনো অবসরকালীন বিধির আওতাভুক্ত নয় এমন যে কোনো সরকারী কর্মচারীকে, **তিরিশ বছর কাজ করার পর** কমপক্ষে তিন মাসের নোটিশে অথবা এই নোটিশের পরিবর্তে তিন মাসের বেতন ও ভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণ করানোর পরিপূর্ণ অধিকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আছে।

(গ) **রুল 48(1)(b) অব সি.সি.এস. (পেনশন) রুলস, ১৯৭২ ঃ** চাকরীকালের ৩০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে যে কোনো সময় একজন সরকারী কর্মচারীকে জনস্বার্থে তার নিয়োগকর্তা তিন মাসের নোটিশে অথবা নোটিশের পরিবর্তে তিন মাসের বেতন ও ভাতা দিয়ে অবসর গ্রহণ করাতে পারেন। এক্ষেত্রে কর্মচারী অবসরকালীন পেনশন পাবার অধিকারী থাকবেন।

বর্তমান আদেশনামায় মেয়াদপূর্তির আগেই কর্মচারীদের অবসরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সততা ও দক্ষতা নিরূপণের জন্য একটি রিভিউ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের যেসব কর্মচারীরা শীঘ্রই ৫০/৫৫ বছর বয়সে পড়বেন বা চাকরীকালের ৩০ বছর পূর্ণ করবেন তাদের নামের একটি রেজিস্টার বা তালিকা তৈরি করতে হবে। এই রেজিস্টারটি দপ্তর বা ক্যাডারের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক প্রতি তিনমাস অন্তর নিরীক্ষণ করে দেখবেন যে সেটি ঠিকমতো তৈরি রাখা হচ্ছে কিনা। যদি কোনো কর্মচারী জুলাই, ২০২০-তে ৫০/৫৫ বছর বয়সে পড়েন বা চাকরি জীবনের ৩০ বছর পূর্ণ করেন তবে তার সততা / দক্ষতার পর্যালোচনা হয়ে যাবে জানুয়ারী, ২০২০-এর মধ্যে, অর্থাৎ ৬ মাস পূর্বেই। এই পর্যালোচনায় কোনো কর্মচারী উৎরে গেলেন মানে এটা নয় যে বাকি চাকরি জীবনে তাকে আর এই পর্যালোচনার মুখোমুখি হতে হবে না। যে কোনো সময়ে তাকে আবার এই পর্যালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে। যদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সততা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়, তবে তাকে অবসর গ্রহণ করানো হবে। যদি দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কর্মদক্ষতা কাজের অনুপযুক্ত, তবে তাকেও অবসরগ্রহণ করানো হবে। কোনো কর্মচারীর অবসরগ্রহণের এক বছর বাকি থাকলে তার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতাজনিত কারণে পর্যালোচনা করা যাবে না, তবে সততা নিয়ে পর্যালোচনা করা যাবে। কর্মদক্ষতাজনিত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কর্মচারীর বিগত ৫ বছরের কাজের পর্যালোচনা করতে হবে। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তাদের A.C.R. খতিয়ে দেখা হবে, এমনকি প্রয়োজন হলে তার সারা কর্মজীবনের সার্ভিস রেকর্ড পর্যন্ত খতিয়ে দেখা হতে পারে। এই রিভিউ কমিটি তৈরি হবে দু'জন সদস্যকে নিয়ে এবং দপ্তরের সচিব এই কমিটির প্রধান হবেন। এই কমিটিকে সাহায্য করার জন্য একটি আভ্যন্তরীণ কমিটি থাকবে। এই কমিটি পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পর্যালোচনার তিনমাস আগে থেকে তৈরি করতে থাকবে।

এতসব পড়ে এমনটা মনে হতেই পারে যে ব্যাপারটা তো খুব একটা খারাপ নয়, এতসব কমিটি ইত্যাদি করে কর্মচারীদের সততা / দক্ষতা ইত্যাদি পরিমাপ করে তবে তো কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ করানো হবে। অথচ বাস্তবে কী ঘটলো? এই আদেশনামাটি বের হয়েছে ২৮ আগস্ট, ২০২০। আর প্রথম অবসর দেওয়া হলো কাবেরী জসোয়ালকে ৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে; অর্থাৎ মাত্র তিন দিনের মধ্যে। তাহলে তার সততা / দক্ষতার পর্যালোচনা হলো কিভাবে, কখন? কবে রিভিউ কমিটি গঠিত হলো আর কবেই বা আভ্যন্তরীণ কমিটি গঠিত হলো? কবেই বা তারা তাদের রিপোর্ট জমা দিলেন? সবকিছু এই তিনদিনের মধ্যেই? এইসব কথা বিশ্বাস করতে হবে আমাদের? আসলে কোনো কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই অবসরগ্রহণ করানো হয়নি। **এইসব কমিটিগুলো শুধু সামনে সাজানো থাকবে, মূলত আমলাদের খেয়ালখুশিতে আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কর্মচারীদের ছাটাই করা হবে।**

আবার চাকরির মেয়াদপূর্তির আগেই অবসরগ্রহণের এই ব্যবস্থাকে সরকার 'বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ' বলতে রাজি নন। এটাকে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলতেও রাজি নয় কেন্দ্রীয় সরকার। সংবিধানের ৩১১-এর (২) ধারায় বলা আছে যে কোনো সরকারী কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোনো তদন্তের সাপেক্ষে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা বা পদাবনতি ঘটানো যাবে না। অথচ এই আদেশনামায় অবসরগ্রহণের পূর্বে কর্মচারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। অবসর গ্রহণের পর কর্মচারীর আত্মপক্ষ সমর্থণে কোনো বক্তব্য থাকলে তিনি রিপ্রেজেনটেশন কমিটির কাছে তা তিন সপ্তাহের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই আদেশনামা সাংবিধানিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে।

এই আদেশনামার মধ্য দিয়ে সরকারের শ্রেণী চরিত্র নগ্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বৃহৎ পুঁজির দালালী করা এই সরকার ইতিমধ্যেই যে সব কৃষি বিল এবং শ্রম বিল লোকসভায় পাশ করিয়েছে তা দেশের কৃষক এবং শ্রমজীবিদের উপর ভয়ানক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। কৃষিক্ষেত্রকে বৃহৎ পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে তিনটি কৃষি বিল। একইভাবে শ্রম বিলগুলি কারখানাগুলিতে হায়ার এন্ড ফায়ার নীতিকেই কার্যকরী করে তুলবে। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই আদেশনামা চালু করা হয়েছে। সরকার ইচ্ছে করলেই কোনো কর্মচারীর অন্তত দশ বছরের চাকরীকাল নষ্ট করে দিতে পারেন। নব্য উদার অর্থনীতির অন্যতম দাওয়াই হলো সরকারী প্রভাবকে খর্ব করে অর্থনীতিকে বাজার নির্ভর করে তোলা। ইতিমধ্যেই বিলগ্নীকরণের ধাক্কায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে তীব্র কর্মী সঙ্কোচন হচ্ছে। বি.এস.এন.এল-এর ৭৮ হাজার কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হলো। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আবার ৩০,০০০-এর উপর কর্মীর জন্য স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প গ্রহণ করেছে, বেসরকারীকরণের মাধ্যমে রেলেও ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সরকারী কর্মচারী বিরোধী আদেশনামা বাতিলের দাবিতে আমাদের তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে করে কেন্দ্রীয় সরকার এই আদেশনামা বাতিল করতে বাধ্য হন। □

করোনা আবহে দেশ ও রাজ্য

কুমকুম মিত্র

সাদা মেঘের আনাগোনায় আকাশ-বাতাশ উৎসবের গন্ধে যতটা ভরে ওঠার কথা, এ বছরে কিন্তু সেই আনন্দ চোখে পড়ছে না। সাধারণ মানুষের মনে শঙ্কার মেঘ কিন্তু ঘন কালো হয়ে জেকে বসেছে। গত ছয় মাস ধরে করোনা সংক্রমণ ও সংক্রমণ ঠেকাতে নেওয়া সরকারী বিধিনিষেধের ধাক্কায় মানুষ অস্থির হয়ে গেছে। করোনা নামক ভাইরাসের জীবন বৃত্তান্ত এখন প্রায় সকলেরই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু এই করোনাকে ব্যবহার করে কাদের পৌষ মাস ও কাদের কতটা সর্বনাশ হলো এটাও এখন আলোচিত হওয়া দরকার। বাজারের এই হট টপিক 'করোনা'কে আরো হট করে দিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, যেন তার আড়ালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি সহজেই করতে পারে, করোনা মোকাবিলার উপায়ান্তরকে দূরে রেখে।

সাধারণত জ্বর, সর্দি, কাশি, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গি, কালাজ্বর, টিবি, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ইত্যাদি প্রভৃতি বহু অসুখ সারা পৃথিবীজুড়ে আছে, যার মধ্যে কিছু সংক্রামক, কিছু অসংক্রামক। 'করোনা' এটা অবশ্যই একটু আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শারীরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সবদিক থেকেই এটা আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাধি। যে কোনো রোগের উপসর্গ বিষয়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপসর্গ অনুযায়ী রোগের শনাক্তকরণ ও মোকাবিলার উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। করোনাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্ব এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন। মহামারি করোনায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, শ'য়ে শ'য়ে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। প্রতিটি দেশ এক অনিশ্চিত যুদ্ধের সম্মুখীন, এই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দিশেহারা সারা পৃথিবী। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা এক অচেনা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে। তারাও আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদেরও প্রাণ নাশ হচ্ছে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এই ভাইরাসের মোকাবিলায় এবং অনেক দেশ সফলভাবে মোকাবিলা করতেও পেরেছে। ব্যতিক্রম বলা যায় আমাদের দেশ। কোনোরকম সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করেই রাষ্ট্রপ্রধানের খামখেয়ালীপনায় মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে গত মার্চ মাসের ২২ তারিখে একদিনের প্রতীকী লকডাউন ও ২৩ তারিখ সন্ধ্যে থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য লকডাউন ঘোষণা করে দেন। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায় স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত, পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষত রেল চলাচল। যদিও বর্তমানে রেল বাদে অন্যান্য যানবাহন অপর্যাপ্ত চলছে, স্বাভাবিক হয়নি এখনো। এই অপরিকল্পিতভাবে ঘোষিত লকডাউনে প্রথমে আটকে থাকা মানুষ শুধু টিকে থাকার জন্য তাদের সামান্য সঞ্চয়টুকু পর্যন্ত খুইয়েছে। গরিব খেটে খাওয়া মানুষ সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য যার দিনের রোজকারটুকুই ভরসা, তারা দিনের পর দিন ঘরে বসে যাওয়ায় টান পড়ে ভাঁড়ারে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশের বিপুল অংশের শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। পাশাপাশি করোনা আতঙ্কে পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফেরার তাগিদে ব্যস্ত হয়ে উঠে, অর্থ, খাদ্য না থাকায়, বিষয়সম্বলহীন হয়ে কেউ পরিবারসহ, কেউ বা একাই কোনোরকম পরিবহন না পেয়ে দিনরাত এক করে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করে বাড়ি ফেরার পথে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকেই পথ দুর্ঘটনায়, অনেকে খাদ্যাভাবে অসুস্থ হয়ে প্রাণও বিসর্জন দেয়। কিন্তু রাষ্ট্র এই সমস্ত ভুখা অসহায় সম্বলহীন মানুষগুলোর ন্যূনতম দায়িত্বটুকুও নিতে অপারগ হয়, এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনাও রাষ্ট্রগ্রহণ করেনি। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার দৃষ্টান্তমূলক নজির স্থাপন করেছে একমাত্র রাজ্য কেরালা। রাষ্ট্র এই মহামারীর দুর্যোগকে শিখণ্ডি করে শ্রমজীবী মানুষেয ন্যূনতম ন্যায্য অধিকারগুলি হরণ করে নেওয়ার উপযুক্ত সময় বলে মনে করলেন। রাষ্ট্র ভালোভাবেই বুঝে গেল এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সবাই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, সুতরাং এই সময়ে বিপুল অংশের অসংগঠিত শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন সম্ভব নয়। কাজেই শ্রম আইন সংশোধন করার এর চেয়ে বড় সুসময় আর কী হতে পারে। কেন্দ্রর এই সিদ্ধান্তকে আরো অনেক রাজ্যও অনুসরণ করছে। যেমন উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক। আবার পাঞ্জাব, রাজস্থান কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা করেছে। এর ফলে শ্রমিকদের উপর শোষণ আরো তীব্র হয়েউঠেছে। শ্রম আইন পরিবর্তন হলে মালিক যেমন সহজেই শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবে, তেমনই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী দেওয়া ও কাজের সুস্থ পরিবেশ দেওয়ার দায়বদ্ধতাও মালিকের থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর অপরিকল্পিতভাবে ঘোষিত এই লকডাউনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত দোকানপাটও, ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। করোনা আবহে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুযোগে দেশের বহু মানুষকে অন্ধকারে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষি বিল বাতিলের দাবিতে দেশের জনগণ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, এছাড়াও সংসদকে এড়িয়ে কেন্দ্র সরকার কয়লাখনি, বিমানবন্দর, রেলকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রেকর্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে পেট্রোল, ডিজেলের দাম। যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সবজির দামও আকাশচুম্বী।

করোনা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সুরাহা করার কোনো পরিকল্পনা রাষ্ট্র নেয়নি। বরং মোদিজী বলেছিলেন যে, করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলে সাধারণ মানুষকেই তার দাম দিতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুবর্গ আম্বানি-আদানিজিরা এই ত্যাগ স্বীকার বা দাম দেওয়ার মধ্যে পড়েনি, উল্টে এই করোনার সময়কালে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছেন। আবার প্রধানমন্ত্রীর নতুন স্লোগান 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার। কিন্তু আত্মনির্ভর ভারত পড়তে প্রয়োজন হলো, দেশের বেশিরভাগ মানুষকে আর্থিক দিকে থেকে স্বনির্ভর করে তোলা, এই মুহূর্তে যার কোনো লক্ষণই চোখে পড়েনি কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে। সাধারণ মানুষের এত ত্যাগ স্বীকারের পরও কিন্তু করোনা যুদ্ধে দেশ জিততে পারেনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আক্রন্তের সংখ্যা। সংক্রমণের নিরিখে আমাদের দেশের স্থান আমেরিকা ও ব্রাজিলের পরেই। দেশে এখনো পর্যন্ত আক্রান্ত ৬১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৪১ জন (২৯/৯/২০ পর্যন্ত) এবং মৃত ৯৪,৬০৩ জন।

আমাদের রাজ্যের অবস্থা অত্যন্ত করুণ করোনাকে কেন্দ্র করে। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শোচনীয়। প্রথমদিকে রাজ্যের শাসকদল তথা কর্ণধার তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় আজ রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত ক্রমবর্ধমান। সরকারী তথ্য অনুযায়ী আজ (২৯/৯/২০) পর্যন্ত আক্রান্ত ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৮০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৮৩৭ জনের। যেভাবে রাজ্যের করোনা আক্রান্ত হয়েছিল বা হচ্ছে সেই তুলনায় উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসন। এখন আনলক্ পর্বে যখন কিছু কিছু পরিবহন চলছে (রেল বাদে), দোকান, অফিস খুলছে, মানুষ পেটের তাগিদে আবার বেরোতে শুরু করছে, এই সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে আরো বেশি করে কোভিড টেস্ট করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পরিকল্পনার অভাবে এই পরীক্ষা ক্রমশ কমছে, যা ভয়ের লক্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে। দেশের অধিকাংশ রাজ্যে যেখানে পরীক্ষার সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশি, সেখানে এ রাজ্যে গত রবিবার পর্যন্ত (২৭/৯/২০) ৪৩ হাজার ৬১৮টি। করোনা আবহে এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা, ছোটো ব্যবসায়ীরা, কৃষকরা সাধারণ মানুষ প্রচণ্ডভাবে বঞ্চিত হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকে। করোনার সাথে ঘূর্ণিঝড় আমফানের সংমিশ্রণে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের মানুষ আর তার সঙ্গে বেড়েছে রাজ্য সরকারের বা শাসকদলের দুর্নীতি। এই সময়ে বঞ্চিত হচ্ছেন সমস্ত কর্মচারী সমাজ। করোনা আবহে এই দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে বাজার আগুন হয়ে উঠেছে সেখানে কোর্টের রায় সত্ত্বেও সরকার কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি.এ টুকু দিতে নারাজ। অথচ সরকারী কোষাগার থেকে পুজো কমিটিকে, পুরোহিতদের, সাংবাদিকদের বিভিন্নভাবে টাকা দিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে। এই করোনা আবহে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে যে বিল মোদিজী আনছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত রাজ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে এই বিল বাতিলের দাবিতে, এখন আমরা এই রাজ্যে দেখছি গণতান্ত্রিক দলগুলি যেমন প্রতিবাদে মুখর হচ্ছে, সঠিক নীতি আদর্শের ভিত্তিতে, পাশাপাশি শাসকদলের পক্ষ থেকেও প্রকৃত স্বাস্থ্যবিধি না মেনে মিছিল করা হচ্ছে, এটা অবশ্যই একটু হাস্যকর তো বটেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও একে কৃষক স্বার্থের পরিপন্থী বলে রাজ্যসভায় বিল পাশের দিনটিকে 'ব্ল্যাক সানডে' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনা হলো, মাঠে ফসল থাকাকালীনই বেসরকারী সংস্থা যাতে চাষিদের কাছ থেকে তা কিনে নিতে পারে, সেজন্য ২০১৪ সালে আইন করেছে এই শাসকদল। এখন তারাই কৃষকদরদী হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি যে সমস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের পরিবার-পরিজন, নিজেদের প্রাণকে উপেক্ষা করে এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে আক্রান্ত মানুষদের সুস্থ করা ছাড়াও সাধারণ জনগণকে সচেতন করা, গ্রামে গঞ্জে গিয়ে মা ও শিশুদের সুরক্ষার যাবতীয় কাজ করে যাচ্ছেন তারাও প্রশাসনিকভাবে যতটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দরকার তা পাচ্ছেন না, বিশেষত গ্লাভস, স্যানিটাইজার, মাস্কের এখনো পর্যন্ত খুবই ঘাটতি, প্রশাসনের কোনো পরিকল্পনা বা এগুলি সরবরাহের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষ ছাত্র-যুব-মহিলা সবাই নিজেদের মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্যকর্মীসহ সাধারণ মানুষের পাশে প্রতিনিয়ত রয়েছেন।

এইরকম একটি সার্বিক ব্যর্থ প্রশাসনকে নির্মূল করতে আমাদের এখনই জোট বাঁধতে হবে খুব দৃঢ়ভাবে। □

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০
সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী

মালদা

কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্প বাতিল কর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধ কর, শ্রম আইন সংস্কার করা চলবে না, কালা কৃষি বিল বাতিল কর প্রভৃতি জনজীবনের জরুরি ৬ দফা দাবি নিয়ে, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ সারা দেশে টিফিনের সময় নিজ নিজ কর্মস্থলের নিকটবর্তী স্থানে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৬ সেপ্টেম্বর সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ভার্চুয়াল সভা থেকে জাতীয় প্রতিবাদদিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

এ রাজ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বভারতীয় সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্লকস্তর পর্যন্ত জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা সহ প্রতিটি জেলা সদরে এবং অধিকাংশ মহকুমা ও ব্লকে ৬ দফা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে শামিল হন কয়েক হাজার কর্মচারী। প্রত্যেকটি বিক্ষোভ কর্মসূচীতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অতিমারি ও লকডাউনজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেই শ্রমিক কর্মচারী ও কৃষকের স্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এ রাজ্যের সরকারও বকলমে এসব নীতি অনুসরণ করছে। ফলে বিক্ষোভ সভাগুলিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচীর প্রস্তুতি হিসেবে এই কর্মসূচীটিতে অংশ নেন কর্মচারীরা। এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় ৬ দফা দাবির সাথে করোনাজনিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় শারীরিক ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিটিও যুক্ত করা হয়েছিল।

কলকাতায় কর্মরত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা, সংগঠনের আহ্বানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে শামিল হন। জেলার কর্মসূচীর মতোই মহাকরণ, নবমহাকরণ, বিকাশভবন, স্বাস্থ্যভবন, খাদ্যভবন, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, পিএসসি দপ্তর প্রভৃতি স্থানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মহাকরণের বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং নবমহাকরণের সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। □

বাঁকুড়া

দিল্লীতে সর্বভারতীয় সংগঠনের নবনির্মিত কেন্দ্রীয় দপ্তর ‘সুকোমল ভবন’

নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

মধ্যাঞ্চল

নিজাম প্যালেসে বিক্ষোভ কর্মসূচী

লবণহ্রদ

নবমহাকরণ

এগরায় সংগঠনের নতুন ভবন

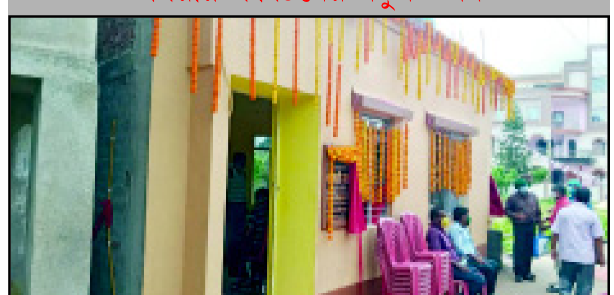

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এগরা মহকুমায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহকুমা কর্মচারী ভবন উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। উপস্থিত ছিলেন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন সুকুমার ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক। প্রায় শতাধিক কর্মচারী ও পেনশনারদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে। এই মহকুমার কর্মচারী, পেনশনারদের কাছ থেকে এগারো লক্ষের বেশি টাকা সাহায্য হিসেবে দান করেন। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৬৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী কর্মসূচী

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ আবারও এক সঙ্কটের আবর্তে রাজ্য সরকারী কর্মচারী তথা মধ্যবিত্ত ও খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। যারা দেশে বেকারীর হার স্বাধীনতা উত্তরকালে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, এ রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ, অথচ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী দপ্তরে শূন্যপদে কোনো নিয়োগ করা হচ্ছে না। উপরন্তু পদ বিলোপ করা হচ্ছে। কর্মী সঙ্কোচনের লক্ষ্যে আগাম অবসর প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যেখানে মাত্র তিন মাসের নোটিশে একজন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার।

এ রাজ্যেও কর্মী সঙ্কোচনের প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়ে সরকারী স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিধান রায়ের সরকার যেমন সমাবেশ করা ও দাবি উত্থাপনের জন্য সাসপেন্ড করেছিলেন কর্মী-নেতৃত্বকে, বর্তমান সময়েও রাজ্য সংগঠন করা দাবি উত্থাপনের জন্য নিয়ম বর্হিভূত, প্রতিহিংসা পরায়ণ বদলির শিকার হতে হচ্ছে কর্মী সংগঠক নেতৃত্বকে। কোভিড মহামারির সময়েও স্বাস্থ্য কর্মীসহ সংগঠনের কর্মচারীদের সু-স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সরকার চরম উদাসীন। এর সাথে মহার্ঘভাতার বঞ্চনা তো রয়েছেই।

ফলে, ভিন্ন চরিত্রের হলেও পাঁচের দশকের মতোই এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন কর্মচারীরা। এর থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য লড়াইও চলছে। এমনকি করোনা পরিস্থিতিতেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরকারের কর্মচারী স্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

৮ সেপ্টেম্বর, সংগঠনের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ এই দিনটিতে সারা রাজ্যে টিফিনের সময় দপ্তরে দপ্তরে শূন্যপদ পূরণ, কর্মী সঙ্কোচনের সিদ্ধান্ত রদ, অনৈতিক বদলির আদেশনামা বাতিল প্রভৃতি ৪ দফা দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত দপ্তরে কর্মচারীদের হাজিরা কম থাকলেও, প্রতিটি জেলা সদর সহ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং লবনহ্রদের বিকাশ ভবনের কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।